দাম : যোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং ভগিনী নিবেদিতার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন— পৃঃ ১৩

দেশ কাঁপানো কয়েকটি দিন — পৃঃ ৩৫

৭৮ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা।। ১০ আগস্ট, ২০২৬।। ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। পনেরো আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

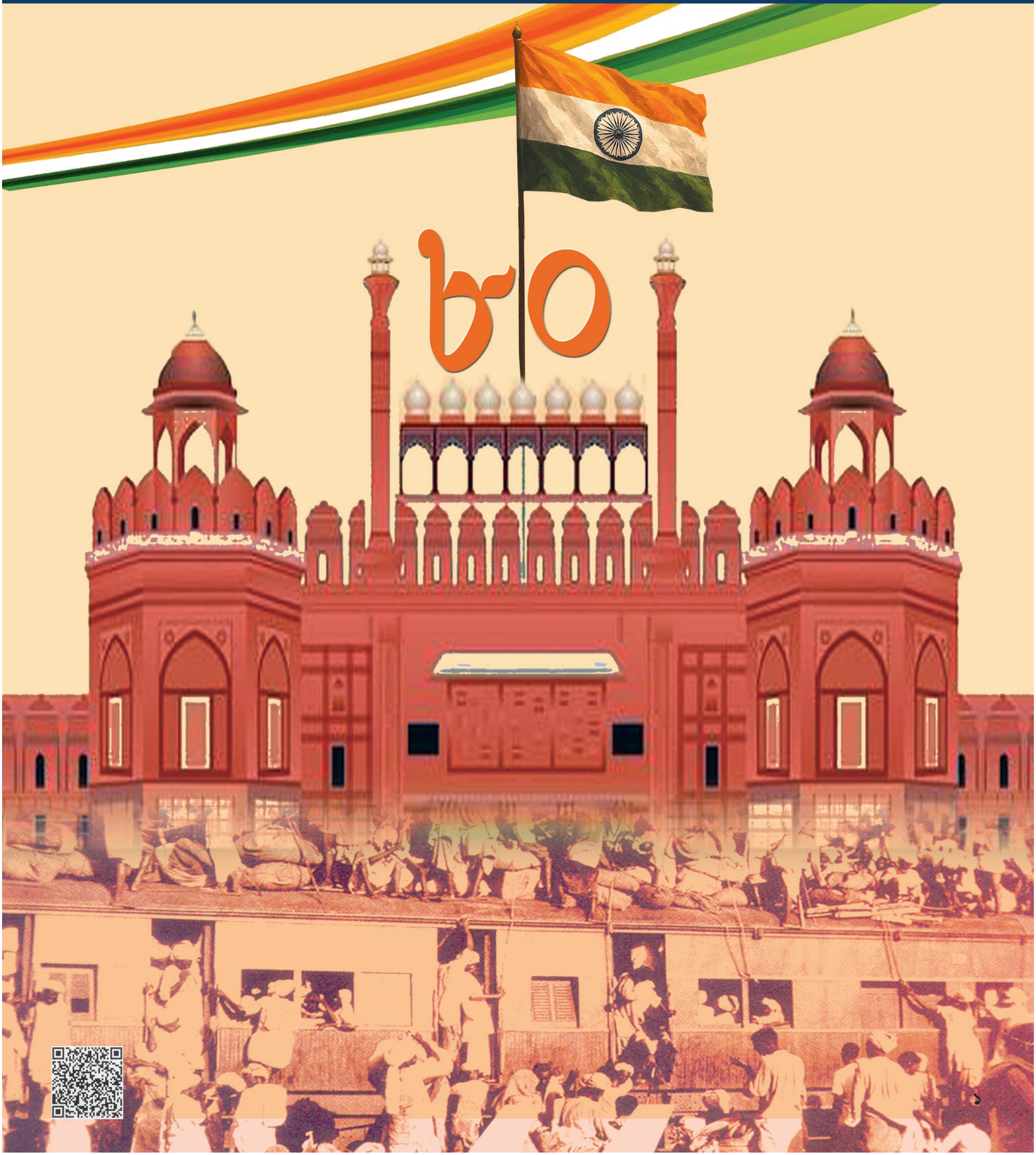

कुटुंब प्रबोधन

जीवन यात्रा की नौका है परिवार,
जिसमे हम सात जन साथ हैं,
भवसागर पार करने हेतु

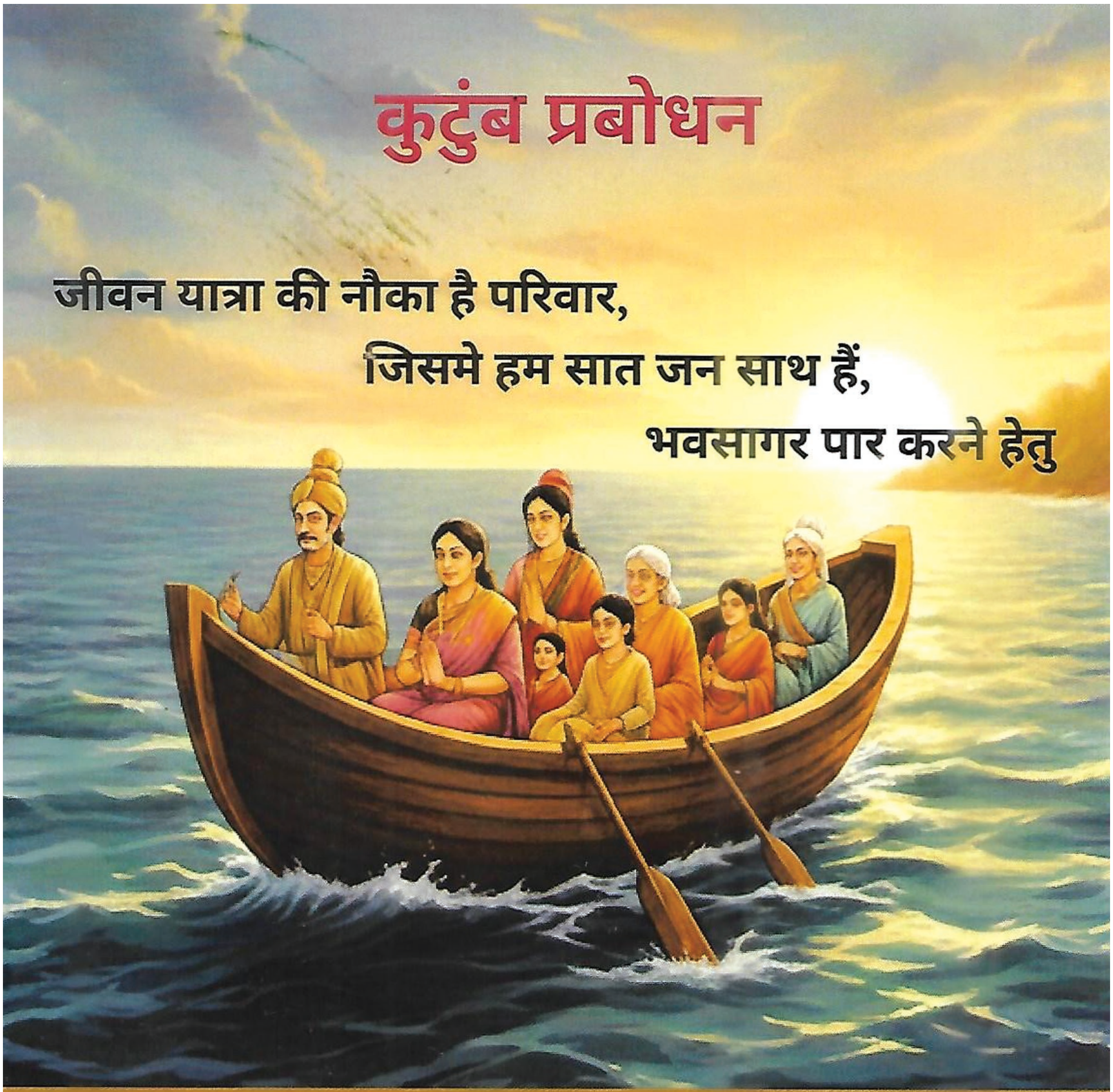

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পনেরো আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

৭৮ বর্ষ ৫০ সংখ্যা, ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১০ আগস্ট - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

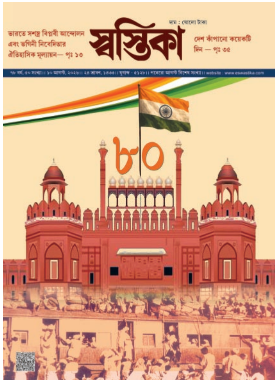

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

রাম ধাক্কাতেই হবে বিদেশিদের উৎখাত আর স্বাধীনতার দ্বিতীয় উৎসব পালন : বাম বিদায় ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদির নামে মিথ্যে কথা শুভেন্দুর! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

শ্রীঅরবিন্দ শুধু একজন মহান বিপ্লবীই নন, একজন যুগদ্রষ্টাও

◻ সৈকত নিয়োগী ◻ ৮

হিন্দু বাঙ্গালি! তুমি তোমার রক্ষাকর্তাকে ভুলো না

◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং ভগিনী নিবেদিতার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ◻ ডঃ বিবেকানন্দ চক্রবর্তী ◻ ১৪

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

◻ বটুকৃষ্ণ হালদার ◻ ১৭

বিপ্লবী ও সন্ন্যাসী শ্রীঅরবিন্দ ◻ ডঃ বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ৩১

অমৃতের অভিযাত্রী পক্ষীরাজ গরুড়ের আত্মত্যাগের অমর কাহিনি ◻ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী ◻ ৩৪

দেশ কাঁপানো কয়েকটি দিন

◻ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় ◻ ৩৫

আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতাযুদ্ধ : এক অগ্নিগর্ভ মহাকাব্য

◻ কেশব আচার্য্য ◻ ৪৩

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লিতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপকারী বীর বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস

◻ তরুণ বিশ্বাস ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
১৭ আগস্ট
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৭ আগস্ট
২০২৬

দেশবিরোধী শক্তির উত্থান

ভারতের অগ্রগতি দেশবিরোধী শক্তিগুলি সহ্য করতে পারে না। বহু দশক পর ভারত যখন সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে চলেছে, তখন তারা বিদেশি শক্তির মদতে তা স্তব্ধ করতে চায়। সবচাইতে দুঃখের বিষয় যে, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের দাবার বোড়ে হয়ে ভারতকে অস্থির করে চলেছে। কয়েক বছর আগের শাহিনবাগ ও কৃষক আন্দোলন এবং সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনের নামে তাদের উসকানি দেখা গিয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই সব বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস সিংহাবলোকনের দিন

প্রতি বৎসর ১৫ আগস্ট দিনটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস রূপে পালিত হইয়া থাকে। দিনটি ভারতের জাতীয় দিবসসমূহের তালিকায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তথাকথিত প্রগতিশীল ও সেকুলার ইতিহাসবিদগণ হাজার বৎসরের পরাধীনতার কথা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে ইংরাজ শাসনের মাত্র দুইশত বৎসর ভারত পরাধীনতা ভোগ করিয়াছে। আর ১৫ আগস্ট সেই ঔপনিবেশিক শাসনের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া জাতি এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে। তাহারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাবৎ মিথ্যা বলিয়াছে যে, ভারত মাত্র দুইশত বৎসর পরাধীন ছিল। আটশত বৎসরের ইসলামি শাসনকালকে তাহারা কী অবলীলায় অস্বীকার করিয়া থাকেন। সেই আটশত বৎসরে ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজের উপরে যত অত্যাচার হইয়াছে; যত হিন্দু মাতা-ভগিনীর সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে; যত মঠ-মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়াছে; যত হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে; তাহা বিশ্বের ইতিহাসে আর কোথাও ঘটে নাই। কী এক অজ্ঞাত কারণে কমিউনিস্ট ও সেকুলার ঐতিহাসিকরা এই নির্মম সত্যটিকে জাতির সম্মুখে প্রকাশ করেন নাই। দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসন এত অন্ধকার ছিল না, কিন্তু প্রবল অত্যাচার ছিল, শোষণ ছিল, ধর্মান্তরণ ছিল। সেই শাসনের অবসানকল্পে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ যখন সংগ্রাম করিয়াছে, তখন বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা দ্বিজাতিতত্ত্বের জিগির তুলিয়া, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের যে, ভারতের কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করিয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে মুসলিম লিগের জেহাদি গুন্ডারা হিন্দু জনমানসে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কলকাতা ও নোয়াখালীতে হিন্দুনরসংহার করিয়াছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতাকামী বীর বিপ্লবীগণ বিশেষ করিয়া বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সর্বাত্মক লড়াইয়ের অভিঘাতে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বলিলেও তাহা ক্ষমতার হস্তান্তর ছিল মাত্র। খণ্ডিত ভারত স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিলেও তাহা ব্রিটিশ কমনওয়েলেথের অধীনস্থ ছিল। তখনও ভারতীয় জাতি ইংল্যান্ডের প্রজামাত্র পরিগণিত ছিল, ইউনিয়ন জ্যাক তখনোও ভারতের আকাশে উড্ডীন ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ইংল্যান্ডের রাজার নামে শপথ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেকুলার ও কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকগণ এই চরম সত্য কোনোদিন প্রকাশ করে নাই। পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায় নাই।

আর একটি সত্য বর্তমান প্রজন্মকে অবগত করানো হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা দিবস কেন ১৫ আগস্ট এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস কেন ১৪ আগস্ট? পাকিস্তান ১৪ আগস্ট দিনটিকে গ্রহণ করিয়াছে এই জন্য যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দিনটি ছিল ২৭তম রমজান যাহা মুসলমানদের নিকট এক অতি পবিত্র দিন। কুচক্রী ব্রিটিশ ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, কারণ ভারতবন্ধু জাপানের নিকট এই দিনটি জাতীয় অপমানের দিন। বিশাল একটি শক্তিধর দেশ যাহাতে কোনোদিন ভারতবন্ধু না হইতে পারে তাহার উদ্দেশ্যে ইহা এক গভীর চক্রান্ত। তাহা সত্ত্বেও দিনটি ভারতবাসীর গৌরবের দিন, আত্মমুক্তির দিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গভীর বেদনার দিনও। কেননা, ইহার এক দিবস পূর্বেই দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদন ঘটিয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখের রক্তে মাটি লাল হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মাতা-ভগিনীর সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে। দেশমাতৃকা খণ্ডিত হইলেও দেশভক্ত ভারতবাসী অখণ্ড ভারতেরই ধ্যান করিয়া থাকেন, পূজা করিয়া থাকেন। কেননা, হিন্দুশাস্ত্রে খণ্ডিত মূর্তির পূজা করিবার বিধান নাই। ১৯৪৭ সাল হইতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ ১৪ আগস্ট দিনটিকে 'অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস' রূপে পালন করিয়া থাকেন। কোটি কোটি স্বয়ংসেবক-সহ কোটি কোটি দেশভক্ত মানুষ বিশ্বাস করেন ভারত পুনরায় অখণ্ড হইবে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন— ইহা কৃত্রিম বিভাজন । তাহা একদিন বিদূরিত হইবেই। ১৫ আগস্ট দিনটি সর্বার্থেই সেই অগণিত বীর যোদ্ধা যাঁহারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য লড়াই করিয়াছেন, মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের দিন। সেই সঙ্গে সিংহাবলোকন করিয়া, দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অখণ্ড রূপ প্রদান করিবার সংকল্প গ্রহণের দিন।

সুভাষিতম্

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ।।

অর্থ ঃ এই শরীর অনিত্য, ধনসম্পদও চিরস্থায়ী নয়। আর মৃত্যু প্রতিদিন নিকটবর্তী হচ্ছে। এই সত্যকে সর্বদা মনে রেখে ধর্মাচরণ করা উচিত।

রাম ধাক্কাতেই হবে বিদেশিদের উৎখাত আর স্বাধীনতার দ্বিতীয় উৎসব পালন

বাম বিদায়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পনেরো বছর আগে এই শিরোনামে খবর করেছিল শহরের এক দৈনিক পত্রিকা। পরে তারা নিজেরাই বামেদের লেজুড় হয়ে যায়। বামেরা উৎখাত হলে রং পালটে তারা নতুন দলের চাটুকারিতা শুরু করে। তাদের একটাই লক্ষ্য। ভারত আর হিন্দুদের বিরোধিতা। আদর্শ বা মর্যাদা বিসর্জন দিতে হলে ক্ষতি নেই।

বিদেশি কমিউনিস্ট আর পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেসিরা শ্রীরামমন্দিরের ত্রিসীমানায় কখন যায়নি। যেমন যায়নি তেলাপোকাদের দল। তাদের ওপর পেলেট গান ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকার যে তাদের নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন সহজে তা মেনে নেবে না তা সকলের জানা। জানা যায়নি কী অবস্থার মধ্যে তা ব্যবহৃত হয়েছিল। কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সহিংস করে তুললে প্রত্যাঘাত হবেই। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি ইন্ডিজোট এই তেলাপোকাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে। নিন্দা করেছে। তারা যে কেন হঠাৎ রামমন্দিরে তস্কর আক্রমণ নিয়ে বিচলিত হয়ে উঠেছে। এটা ভাবার সময় হয়েছে। ভালো না লাগলেও মানতে হবে যে দেশের ভিতর এই ধরনের খুচরো শত্রুরা যেখানে রয়েছে, সেখানে মর্যাদা পুরুষোত্তমের গৃহে তস্কর হানা নিশ্চিতভাবে কালসাপ প্রবেশের সমান।

স্বাধীনতা-উত্তর সময় বিদেশি বামেরা ভারতের স্বাধীনতাকে 'ঝুটা বা মিথ্যা' বলেছে। তারাই এখন একস্বরে জানতে চায় স্বাধীনতা আন্দোলনে কারা ভারতের পতাকা ধরেছিল বা তুলেছিল। কয়েকদিন আগে খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস সভাপতির পুত্র শিশুদের মতো কিছু প্রশ্ন করেছিল। আদালতে তা খারিজ হয়ে যায়। তাকে মুখ বন্ধ রাখতে বলা হয়। গোটা বিষয়টি তামাদি হয়ে গিয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিদেশি বামেরাও এই ধরনের বালখিল্য প্রশ্ন তোলে। তাই জনগণের পক্ষ থেকে তাদের নির্বাসন দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সিপিএম কখনো ৪০ শতাংশ ভোট পায়নি। অথচ বিজেপি, তস্কর দল আর কংগ্রেস তা পেয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে এককভাবে ৪০ শতাংশ ভোট পেতেই হবে। বিদেশিরা ব্যতিক্রম। যেমন বামফ্রন্ট। ২০০৬-এ ৩৯ শতাংশ ভোট পাওয়া সিপিএম ২০১১-তে মুখ থুবড়ে পড়ে (৩১ শতাংশ) আর তারপর থেকে এরাজ্যে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব আর নেই। হিন্দু বিরোধী ভোট কাটুয়া হয়ে বেঁচে রয়েছে। ১৯৫২ সালের পর থেকে কেবল একবার (১৯৫৭) সাধারণ ভোটে অবিভক্ত বিদেশি বাম ১০ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়েছিল। ২০০৪ সালে সংসদে ৬৯টি আসন লড়ে তারা ৪৩টি আসন পায়। অথচ সারা দেশে সেবার তাদের ভোট হয় মাত্র ৫.৬৬ শতাংশ। এই ধরনের খুচরো আর বিদেশি ভাবাদর্শ সংবলিত দল দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর।

তাদের একসময়ের বন্ধু জওহরলাল নেহরু ঠাট্টা করে বলতেন, আপনাদের দলটা ভারতের। কিন্তু আদর্শ আর ভাবনাটা বিদেশের। বহুদিন থেকে 'ভারতের আর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির' তারতম্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস অনেকটা ইচ্ছা করেই সে আলোচনায় ঢোকেনি। সমস্যা জিইয়ে রেখেছিল। বিদেশিরা আজও 'ভারতের' থেকে গিয়েছে। 'ভারতীয় হয়ে ওঠেনি। যারা ভারতীয় নয়, ভারত ভাবনায় তাদের কী অংশ থাকতে পারে!

এই বামপন্থীদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বহু মিল। ভারত বিরোধী ভাবনায় ব্যবসা করে তারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। বহুবার ভাঙার পরেও আবার কবর থেকে তারা উঠে এসেছে। বাঙ্গালি আর ভারতের কিছু তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মদতে তাদের এই উত্থান। তবে যে জেন-জি কে ঘিরে তেলাপোকাদের উত্থানে অনুপ্রবেশ তারা করতে পারবে বলে মনে হয় না। ১৪০ কোটির দেশে আনুমানিক ২৯ শতাংশ জেন জি-র আওতাভুক্ত।

সকলে যে এই তেলাপোকা আন্দোলনে রয়েছে তা নয়। একটা বড়ো অংশ তাদের সঙ্গে রয়েছে বলে মেনে নিলেও এটা ঠিক যে ২৯ শতাংশের প্রায় ৭০ শতাংশ তাদের সঙ্গে নেই। এই রাজ্যে জেন-জির সংখ্যা আনুমানিক ২.৬০ লক্ষ বা ২৫.৮ শতাংশ। কোনোভাবেই এদের কাছে বিদেশি আর ক্ষতিকারক বামেদের পৌঁছতে দেওয়া যাবে না যেমন সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসির কাছে বল পৌঁছতে দেয়নি স্পেনের খেলোয়াড়রা। ১২০ মিনিটের খেলায় ১১৬ মিনিটে একটিও শট নিতে না পেরে হেরে যায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ঠিক সেরকমভাবেই বাম বিদায় সুনিশ্চিত করে কর্কট রোগ নির্মূল করতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদির নামে মিথ্যে কথা শুভেন্দুর

নিরপরাধেষু দিদি,

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কথায় কথায় বলেন আপনি নাকি সব জানেন বা জানতেন। কিন্তু আমি জানি দিদি, আপনার আমলে এত লোককে আপনি রাজ্যের ইজারা দিয়ে দিয়েছিলেন যে সবাইকে আপনি চিনতেনও না। তারা সময় মতো খাজনা মানে কাটমানির ভাগ দিচ্ছেন কিনা সেটুকুই শুধু আপনি জানতেন। টালিগঞ্জ অরূপের, টলিউড স্বরূপের, সন্দেশখালি শাজাহানের, বীরভূম কেষ্ট, কাজলের এই রকম কত ইজারাদার। সুতরাং আপনি কোনো ভাবেই তো পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের খোঁজ জানতেন না। এখন যার খোঁজই মিলছে না। এদিকে দিদি তার তুতো ভগ্নিপতি মিনার মণ্ডলের পরে ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জেরা করেই মিলেছে একটি ডায়েরি, যাতে লেখা রয়েছে প্রশাসনের আধিকারিকদের নাম। কিন্তু কেন নামগুলি লেখা, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রশ্ন, তারা কি কোনো ভাবে মদত দিতেন টুলুর পাথর ব্যবসার ডিসিআর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট) জালিয়াতিতে! সেই জাল রসিদ ছাপানোর যন্ত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বুন্দেশ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত টুলুর ২২০ কোটি টাকার সম্পত্তি 'ফ্রিজ' করা হয়েছে। তার মধ্যে আত্মীয় মিনারের বাড়ি থেকে মেলা ৫০ কোটি টাকার সোনা ও নগদও রয়েছে। টুলুর ব্যবসার ম্যানেজার ছিলেন সীতেশ।

কেষ্ট মানে, অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত টুলু বেআইনি ভাবে পাথরের ব্যবসা চালাচ্ছিলেন বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুবাবু যতই বলুন, তদন্তকারীদের একাংশ যতই মনে করুক যে আপনি সব জানতেন তা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি একজন মহান সততার প্রতীকে সেখানে কে টুলু, কে ভুলু তা কি আপনার জানার কথা! এখন বলা হচ্ছে, রাজ্যের সব টুলুদের সব কারবার ফুলেফেঁপে ওঠার নেপথ্যে হাত রয়েছে দলের এবং দলনেত্রীর। এবং সব চেয়ে বেশি হাত নাকি দল-ভাইপোর। পুলিশ ও প্রশাসন নাকি তার কথা মতোই টুলুকে কোলে কোলে রাখত। তাদের নিয়মিত কলটা, মুলোটা নয় একেবারে পিৎজা, বার্গার দেওয়া চলত। তাঁদের নামই এখন টুলুর লোক সীতেশকে জেরা করে মেলা ডায়েরিতে রয়েছে।

জেলা পুলিশের দাবি, টুলু বিদেশে বসেও এলাকায় তার ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। পাশাপাশি, জাল ডিসিআরচক্র এখনও সক্রিয় বলে দাবি পুলিশের একাংশের। ২৪ জুলাই মহম্মদবাজার থানা এলাকাতেই একটি পাথর বোঝাই ডাম্পারের নথি পরীক্ষা করতে গিয়ে জাল ডিসিআরের হদিস পান ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকেরা। লরিচালক যে ডিসিআর যে ডিসিআর দেখিয়েছেন, সেই নম্বরের ডিসিআর আদৌ নথিভুক্ত নয় সরকারি রেজিস্টারে। মহম্মদবাজার থানায় ভূমি রাজস্ব-দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে জাল ডিসিআরের এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে।

> **আপনার সরকারের আমলে পাথর খাদান থেকে বছরে ৬০ থেকে ৮০ কোটি টাকা রাজস্ব আসত। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ১১ মে থেকে ১১ জুন— এই এক মাসে একটি জেলার পাথর খাদান থেকে ৮৩ কোটি টাকা রাজস্ব এসেছে। আগে ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব হিসেবে সরকারের ঘরে জমা হতো। ১১০০ কোটি বেরিয়ে যেত।**

বীরভূমের পুলিশ সুপার বুন্দেশ জানিয়েছেন, 'সুসংগঠিত ভাবে অপরাধ চালাত সিন্ডিকেট'। টুলুর বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা অর্থ, স্থায়ী আমানতের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার ২২০ কোটি টাকার সম্পত্তি 'ফ্রিজ' করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫০ কোটি টাকা মূল্যের নগদ ও সোনা টুলুর তুতো ভগ্নিপতি মিনারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। মোট ৪০০ বিঘা জমির উপরে বেশ কিছু বাড়ি, সম্পত্তি রয়েছে টুলুর। সেই নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। সীতেশের বয়ানের ভিত্তিতে ডিসিআর ছাপানোর যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রাগ করবেন না দিদি। এখন আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করছি যে, আপনার 'সাপোর্ট' ছাড়া এসব করা সম্ভব ছিল না টুলুবাবুর। কেন বিশ্বাস করছি জানেন দিদি! টুলুবাবুর সাতটি বাড়ি, একটি খামারবাড়ি, দু'টি পেট্রোল পাম্প, একটি ইটভাটা, একটি পার্কিং, তিনটি পাথর খাদান, দু'টি ক্রাশার, ৩০০ বিঘা জমিও বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। আপনারও তো এত কিছু নেই মনে হয়। আপনার সরকারের আমলে পাথর খাদান থেকে বছরে ৬০ থেকে ৮০ কোটি টাকা রাজস্ব আসত। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ১১ মে থেকে ১১ জুন— এই এক মাসে একটি জেলার পাথর খাদান থেকে ৮৩ কোটি টাকা রাজস্ব এসেছে। আগে ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব হিসেবে সরকারের ঘরে জমা হতো। ১১০০ কোটি বেরিয়ে যেত।

কী বলি বলুন তো দিদি! ❑

শ্রীঅরবিন্দ একজন মহান বিপ্লবীই নন, একজন যুগদ্রষ্টাও

সৈকত নিয়োগী

ইতিহাসের এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের নাম শ্রীঅরবিন্দ। যাঁর হাতে একদিকে বিপ্লবের গোপন নকশা, অন্যদিকে উপনিষদের নিস্তব্ধ বাণী; যিনি একসময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চোখে ছিলেন— 'The most dangerous man in India', অথচ জীবনের পরবর্তী পর্বে নিজেকে নিবেদন করলেন এমন এক সাধনায়, যার লক্ষ্য ছিল সমগ্র মানবচেতনার বিবর্তন। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই জীবন যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যায়, এরা পরস্পরের পরিপূরক। শ্রীঅরবিন্দের কাছে রাজনীতি ছিল ধর্মের বহিরঙ্গ, আর সাধনা ছিল জাতীয় জীবনের অন্তঃশক্তি। তাই তাঁকে কেবল বিপ্লবী অথবা কেবল যোগী বলে চিহ্নিত করলে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বের অর্ধেকই অনালোচিত থেকে যায়।

উনিশ শতকের অন্তিম দশকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি ছিল মূলত আবেদন, নিবেদন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারত সরকার প্রণীত আইনসমূহের সংস্কারের আশায় আবদ্ধ। কিন্তু নবজাগরণের বঙ্গ অন্য এক স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' মাতৃভূমিকে দেবীমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছে; স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন--- দুর্বলতা পাপ; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আত্মমর্যাদার সাংস্কৃতিক ভাষা নির্মাণ করছেন। এই সময়েই বরোদায় কর্মরত তরুণ অরবিন্দ উপলব্ধি করলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিবর্তন নয়; এটি হবে একটি জাতির আত্মার পুনর্জন্ম।

ইংল্যান্ডে শিক্ষালাভ তাঁকে ইউরোপীয় 'নেশন-স্টেট'-এর চিন্তার সঙ্গে পরিচিত করেছিল, কিন্তু দেশে ফিরে তিনি যেন নতুন

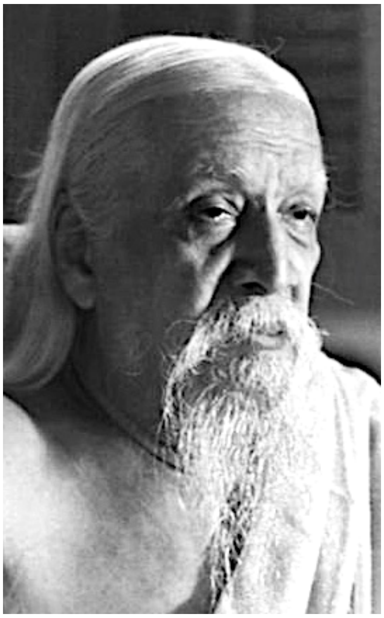

বঙ্গের বিপ্লবী সমাজের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ কোনও পার্শ্বচরিত্র নন; তিনি সেই নীরব কেন্দ্র, যাঁর চারদিকে এক প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও আত্মজাগরণের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে।

করে আবিষ্কার করলেন ভারতকে। বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র— সব মিলিয়ে তাঁর মনে গড়ে উঠল এক অনন্য জাতীয় দর্শন। পরবর্তী জীবনে তিনি লিখেছেন— ভারতীয় জাতীয়তাবোধ নিছক রাজনৈতিক মতবাদ নয়; এটি এক শক্তি, এক জীবন্ত চেতনা। এই উপলব্ধিই তাঁকে সমকালীন বহু নেতার থেকে আলাদা করে দিয়েছে। তাঁর কাছে দেশপ্রেম আবেগ নয়— সাধনা; স্বাধীনতা রাজনৈতিক অধিকার নয়— জাতির আত্মধর্ম অনুধাবন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সেই চিন্তাকে বিস্ফোরিত করে। কলকাতার রাস্তায় তখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি, বিদেশি বস্ত্র বর্জনের আন্দোলন, ছাত্রসমাজের অভূতপূর্ব উন্মেষ। এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দ রচনা করলেন— 'ভবানী মন্দির'। এটি কোনও সাধারণ রাজনৈতিক পুস্তিকা নয়; এটি জাতীয় পুনর্জাগরণের এক আধ্যাত্মিক সংকল্পপত্র। তিনি লিখেছেন— 'আমাদের যা নেই, তা শক্তি; আর শক্তির উৎস আত্মনিবেদন।' ভবানী এখানে কেবল পুরাণের দেবী নন; তিনি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতীক। সেই শক্তির উপাসনা মানে আত্মসংযম, চরিত্রগঠন এবং নিঃস্বার্থ কর্মে আত্মনিয়োগ। 'ভবানী মন্দির'-এর মূল বক্তব্য ছিল— এমন এক তপস্বী-সঙ্ঘ গড়ে তোলা, যারা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। এই ভাবনা পরে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তরের বহু কর্মীর মানসগঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী সময়ে 'Bande Mataram' পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ যে রাজনৈতিক পরিভাষা নির্মাণ করেছিলেন, তা ভারতীয় জাতীয়তার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর সম্পাদকীয়গুলি ছিল যুক্তির দীপ্তি, সাহিত্যিক সৌন্দর্য এবং বিপ্লবী সাহসের এক বিরল সমন্বয়। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন--- স্বাধীনতা ভিক্ষা করে অর্জিত হয় না; জাতির আত্মশক্তির দ্বারা তাকে অর্জন করতে হয়।

তাঁর লেখায় প্রথমবারের মতো 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র ধারণা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষা পায়; যে ধারণা পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সরকারি নীতিতে পরিণত হতে আরও দুই দশক অপেক্ষা করতে হয়। Bande Mataram-এর ভাষা ব্রিটিশ প্রশাসনকে এতটাই উদ্বিগ্ন করেছিল যে, পত্রিকাটির বিরুদ্ধে একাধিক রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়, যদিও শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সম্পাদনার অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'নমস্কার'-এ লিখেছেন--- 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' এটি কেবল ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ছিল না; এটি ছিল সমগ্র দেশভক্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের পক্ষ থেকে এক স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন— শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে তিনি এমন এক কণ্ঠস্বর শুনছেন, যা কেবল প্রতিবাদ নয়, জাতির আত্মার ভাষা।

এই সময়ের বিপ্লবী সংগঠনগুলির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা প্রত্যক্ষের চেয়ে অনেক বেশি ছিল পরোক্ষ ও আদর্শগত। অনুশীলন সমিতির বহু কর্মী তাঁর বক্তৃতা ও লেখাকে প্রায় নিত্যপাঠের মর্যাদা দিতেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যিনি বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম সংগঠক, পরে স্মৃতিচারণে লিখেছেন যে, দাদা অরবিন্দের কাছে জাতীয়তা কোনও রাজনৈতিক কৌশল ছিল না; ছিল এক ধর্মবিশ্বাস। বিপ্লবী মতিলাল রায়ও স্মরণ করেছেন, শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে এসে তাঁদের কাছে বিপ্লব মানে কেবল বোমা বা রিভলভার নয়, আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়োগ। এই কারণেই বঙ্গের বিপ্লবী সমাজে চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য, শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও আত্মত্যাগের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

১৯০৮ সালের আলিপুর বোমা মামলা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ। মুজাফ্ফরপুরে বিচারক কিংসফোর্ডকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপের ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার ব্যাপক ধরপাকড় চালায়। শ্রীঅরবিন্দও গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘ এক বছর তিনি আলিপুর জেলের নির্জন কারাকক্ষে বন্দি ছিলেন। আদালতে তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর ঐতিহাসিক সওয়ালে তিনি বলেছিলেন--- আজ যাঁকে আপনারা অভিযুক্ত হিসেবে দেখছেন, ভবিষ্যতের ভারত তাঁকে অন্য চোখে দেখবে। ইতিহাস সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করেছে।

কিন্তু আলিপুর জেলের প্রকৃত ইতিহাস আদালতের নথিতে নয়; তা নিহিত রয়েছে এক মানুষের অন্তর্জাগরণে। সেই এক বছরের নিঃসঙ্গতা শ্রীঅরবিন্দকে এমন এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়, যা তাঁর সমগ্র জীবনদর্শন বদলে দেয়। উত্তরপাড়ার ভাষণে তিনি পরে বলেছিলেন, কারাগারের মধ্যে তিনি সর্বত্র বাসুদেবকে অনুভব করেছিলেন; বন্দিদের মধ্যে, প্রহরীদের মধ্যে, এমনকী কারাগারের প্রাচীরের মধ্যেও। রাজনীতির সংগ্রাম সেখানে এক নতুন অর্থ লাভ করে; স্বাধীনতা আর কেবল বিদেশি শাসনের অবসান নয়, মানুষের অন্তরের ভয়, দাসত্ব ও অন্ধকারের মুক্তিও বটে।

আলিপুর কারাগার থেকে মুক্তির পর ১৯০৯ সালের ৩০ মে উত্তরপাড়ার ধর্মরক্ষিণী সভায় প্রদত্ত ভাষণ ভারতীয় জাতীয়তার ইতিহাসে এক অনন্য দলিল। রাজনীতির উত্তপ্ত আবহে উপস্থিত শ্রোতারা আশা করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ হয়তো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আরও তীব্র সংগ্রামের আহ্বান জানাবেন। কিন্তু তিনি যে অভিজ্ঞতার কথা বললেন, তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। তিনি বলেছিলেন, কারাগারের নির্জনতায় তিনি উপলব্ধি করেছেন--- 'It was Vasudeva who was in the jail and not I— it was Vasudeva who surrounded me.' এই উক্তি নিছক ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ নয়; এটি তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক দর্শনের পুনর্নির্মাণ। তিনি বুঝেছিলেন— ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কেবল একটি জাতির পুনর্জন্ম নয়, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার সূচনা। উত্তরপাড়া ভাষণের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল— সনাতন ধর্ম তাঁর কাছে সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং এমন এক চিরন্তন সত্য, যা মানুষের আত্মমুক্তি ও বিশ্বমানবতার পথ নির্দেশ করে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের জাগরণ প্রয়োজন মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য।

অনেকের ধারণা, ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরিতে চলে যাওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি ত্যাগ করেছিলেন। ইতিহাসের গভীর পাঠ সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে না। তিনি সক্রিয় দলীয় রাজনীতি থেকে সরে এলেও জাতীয় জীবনের প্রশ্নে তাঁর আগ্রহ কখনও লোপ পায়নি। কর্মযোগিন্ পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলিতে তিনি যে কর্মদর্শন ব্যাখ্যা করেন, তা ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার এক মৌলিক সংযোজন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি—'All life is Yoga'। শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার সূত্র নয়; এটি কর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও রাষ্ট্রচিন্তাকে একই ধারায় দেখার আহ্বান। তাঁর কাছে 'কর্মযোগ' মানে সংসার ত্যাগ নয়, বরং কর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরচেতনার বিকাশ। জাতীয়তাবোধও সেই কর্মযোগেরই একটি প্রকাশ।

এই কারণেই তাঁর সাধনা কখনও নিছক ব্যক্তিগত মুক্তির অন্বেষণ হয়ে ওঠেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে জাতির বিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যে মানুষ অন্তরে পরাধীন, সে বাহ্যিক স্বাধীনতারও যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। এই ভাবনা বঙ্গের বিপ্লবী সমাজে গভীর রেখাপাত করেছিল। বিপ্লবী সংগঠনগুলিতে যে আত্মসংযম, নীরব অধ্যবসায়, চরিত্রগঠন এবং মৃত্যুকে অবহেলা করার মানসিকতা দেখা যায়, তার পেছনে কেবল সামরিক অনুশীলন ছিল না; ছিল এক গভীর নৈতিক দর্শন।

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'The Tale of My Exile' গ্রন্থে দাদার প্রভাবের কথা স্মরণ করতে গিয়ে লিখেছেন--- অরবিন্দের কাছে জাতীয়তা ছিল এক সাধনা। ব্যক্তিগত সুখ, নিরাপত্তা কিংবা প্রতিষ্ঠার চেয়ে জাতির কল্যাণ ছিল বড়। বিপ্লবী মতিলাল রায়ও তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ

করেছেন— শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে এসে তাঁদের রাজনৈতিক জীবন এক ধরনের ব্রতজীবনে রূপান্তরিত হয়েছিল। চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার নেপথ্যেও এই আত্মনিবেদন ও কর্মযোগের ভাবধারা সুস্পষ্টভাবে কাজ করেছে। বিপ্লবের সঙ্গে সমাজসেবা, শিক্ষা, চরিত্রগঠন ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের যে সংযোগ প্রবর্তক সঙ্ঘে দেখা যায়, তার বীজ নিহিত ছিল শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে।

হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর স্মৃতিচারণে বিপ্লবীদের প্রস্তুতির কথা লিখতে গিয়ে যে কঠোর শৃঙ্খলা, আত্মসংযম এবং গোপন জীবনের কথা বলেছেন, তা কেবল সংগঠনের নিরাপত্তার জন্য ছিল না; তা ছিল আত্মগঠনেরও একটি প্রক্রিয়া। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের বিশ্লেষণে বারবার আত্মশক্তির প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। যদিও প্রত্যেক বিপ্লবীর পথ ও মত অভিন্ন ছিল না, তবু তাঁদের প্রজন্মের উপর শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

বিপ্লবী বাঘা যতীনের জীবনেও এই প্রভাবের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে যে অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিসর্জনের মানসিকতা দেখা যায়, তা কেবল সামরিক সাহসিকতার ফল নয়; তা নবজাগরণের সেই বৃহত্তর বৌদ্ধিক পরিবেশেরই অংশ, যেখানে শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করছিল। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জীবনেও আত্মগোপন, সংগঠনশক্তি এবং অদম্য নিষ্ঠার যে পরিচয় আমরা পাই, তা একই জাতীয় চেতনার ধারাবাহিকতা বহন করে।

সুভাষচন্দ্র বসুও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। তাঁর কাছে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সেই বিরল মানুষ, যিনি জাতীয়তাকে আধ্যাত্মিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। যদিও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কৌশল ছিল ভিন্ন, তবু আত্মশক্তি, ত্যাগ এবং জাতীয় সম্মানের প্রশ্নে দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে গভীর অন্তঃসাম্য লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসের এই উত্তরাধিকারই বঙ্গের বিপ্লবী সমাজকে কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টা হিসেবে নয়, এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আজকের দিনে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়শই দু'টি চরম প্রবণতা দেখা যায়। একদল তাঁকে শুধু আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে স্মরণ করেন, অন্যদিকে আর-একদল কেবল বিপ্লবী নেতা হিসেবেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখেন। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিই অসম্পূর্ণ। তাঁর রাজনৈতিক রচনা না পড়ে তাঁর সাধনাকে বোঝা যায় না; আবার 'The Life Divine' বা 'Essays on the Gita' না পড়ে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের গভীরতাও উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাঁর সমগ্র জীবন যেন একটি সেতু— যেখানে কর্ম ও ধ্যান, বিপ্লব ও সাধনা, জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমানবতা পরস্পরকে অতিক্রম না করে বরং সমন্বিত হয়েছে।

বঙ্গের বিপ্লবী সমাজের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের অবদান তাই কেবল কয়েকটি গোপন বৈঠক, কয়েকটি সম্পাদকীয় বা একটি ঐতিহাসিক মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর প্রকৃত অবদান ছিল মানুষের অন্তরে স্বাধীনতার ধারণাকে নতুন অর্থ দেওয়া। তিনি শিখিয়েছিলেন— যে স্বাধীনতা আত্মাকে স্পর্শ করে না, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না; যে বিপ্লব চরিত্রগঠনের ভিতের উপর দাঁড়ায় না, তা শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার লড়াইয়ে পরিণত হয়। তাঁর কাছে ভারতের মুক্তি ছিল কেবল ব্রিটিশ শাসনের অবসান নয়; তাঁর কাছে ভারতবর্ষের মুক্তি ছিল মানুষের ভেতরের ভয়, হীনম্মন্যতা ও আত্মবিস্মৃতির অবসান।

আজ স্বাধীনতার আট দশকেরও বেশি সময় পরে দাঁড়িয়ে যখন আমরা সেই উত্তাল সময়ের দিকে ফিরে তাকাই, তখন উপলব্ধি করি, শ্রীঅরবিন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং একটি মানসিক বিপ্লব। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে আত্মার গভীরতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

তিনি দেখিয়েছিলেন— বিপ্লবের আগুন যদি অন্তরের তপস্যায় শুদ্ধ না হয়, তবে তা ধ্বংস ডেকে আনে; আর সাধনা যদি মানুষের দুঃখ, সমাজের অবিচার এবং জাতির অপমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তা অসম্পূর্ণ। এই দুইয়ের মিলনেই তাঁর জীবন এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

তাই বঙ্গের বিপ্লবী সমাজের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ কোনও পার্শ্বচরিত্র নন; তিনি সেই নীরব কেন্দ্র, যাঁর চারদিকে এক প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও আত্মজাগরণের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। বন্দুকের গর্জন স্তব্ধ হয়েছে, সাম্রাজ্যের পতাকা নেমেছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু রাজনৈতিক স্লোগান জনসাধারণ বিস্মৃত হয়েছে; কিন্তু আত্মশক্তির যে মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ইতিহাসের দীর্ঘ প্রবাহে সেই মন্ত্রই তাঁকে শুধু একজন মহান 'বিপ্লবী' নয়, একজন 'যুগদ্রষ্টা' হিসেবে অমর করে রেখেছে। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

হিন্দু বাঙ্গালি! তুমি তোমার রক্ষাকর্তাকে ভুলো না

যারা নিজেদের ইতিহাস মনে রাখে না, তারা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে বাধ্য হয়। ১৯৪৬-এর সেই দুর্দিনের ইতিহাস ও তার ত্রাণকর্তা এই তিন বীর মহাপুরুষকে ভুলে গেলে বাঙ্গালি হিন্দুর আবার ১৯৪৬-এর পরিণতি হবে।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

সে স্বাধীনতা পাওয়ার আগের বছরের কথা। যে বছর 'একই বৃন্তে দুই কুসুম'-এর গন্ধে মাতোয়ারা বাঙ্গালি হিন্দু কলকাতা থেকে নোয়াখালী, কুমিল্লা থেকে সিলেট তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছিল নিজেদের প্রাণ আর ঘরের লক্ষ্মীদের সতীত্বের বিনিময়ে। নিরীহ, নিরস্ত্র, নিরপরাধ হিন্দুর রক্তে সেদিন কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল কলকাতার রাজপথ। জেহাদি সন্ত্রাসে লাখো মা-বোনের সম্ভ্রম লুটেছিল ধুলায়। অসহায় সন্ত্রস্ত হিন্দুকে বাঁচাবার জন্য কোনো দল, নেতা, সরকার বা শান্তির ধ্বজাধারী কেউ এগিয়ে আসেনি।

সাল ১৯৪৬। সারা দেশে তখন একদিকে চলছে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার চূড়ান্ত লড়াই, আর অন্যদিকে মুসলমান মহল্লায় মহল্লায় চলছে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে ভারত ভেঙে 'পাকিস্তান' ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি। জিন্না ডাক দিলেন 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর। দিনটা ছিল ১৬ অগাস্ট, শুক্রবার, রমজান মাসের ১৮তম দিন। ইসলামি ইতিহাস মতে বদরের যুদ্ধে সেদিন মুসলমানরা মক্কা জয় করেছিল। অবিভক্ত বঙ্গের মুসলিম লিগ সরকার জেনে-বুঝে সেদিন হরতাল ও সরকারি ছুটি ঘোষণা করে রেখেছিল। বঙ্গপ্রদেশের প্রিমিয়ার সুরাবর্দি সকালে কলকাতার অক্টারলোনি মনুমেন্ট ময়দানে (অধুনা শহিদ মিনার ময়দানে) ডেকেছিলেন মুসলিম লিগের বিশাল সমাবেশ। সেখানে মুসলিম লিগ নেতৃত্ব ঘোষণা করে— 'কাফের! হয় তোমরা পাকিস্তান মেনে নাও, নয়তো মরার জন্য প্রস্তুত হও। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!' মুসলিম লিগের এহেন উস্কানিমূলক বক্তৃতায় সভাস্থলে তখন চরম উত্তেজনা। সভা শেষ হতে ধর্মতলা চত্বরে শুরু হলো বেছে বেছে হিন্দু বাড়িঘর, দোকান লুঠপাঠ ও অগ্নিসংযোগ। দুপুরবেলায় কলকাতা জুড়ে তা পরিণত হলো ব্যাপক হারে হিন্দু নিধনে। সন্ধ্যা নামতে নামতে ফের শুরু হলো হিন্দু পাড়ায় লোহার রড, তলোয়ার, গুলি, পিস্তল নিয়ে আক্রমণ।

এই ছিল জেহাদি মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন। 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'! কার ওপর ডাইরেক্ট অ্যাকশন? শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে? না, শাসকের বিরুদ্ধে নয়, নিরীহ হিন্দুর ওপরে। কী জন্য? কী তাদের দোষ? দোষ হলো কাফের হিন্দু হলো মুসলমানদের ক্ষমার অযোগ্য। তারা দেশ ভাগের বিরোধী। তারা অবিভক্ত বঙ্গকে পাকিস্তানে যেতে দিতে নারাজ। তারা ভারতে থাকতে চায়। ভারতবাসী হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে চায়। এটা কি হিন্দুর কম অপরাধ? জেহাদিদের দাবি ছিল পুরো বঙ্গ পাকিস্তানকে দিয়ে দিতে হবে। হিন্দুরা তা চায়নি। তার জন্য গোটা বঙ্গ আদায় করার এই যুদ্ধ, নাম তার—'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'।

১৬ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে কলকাতার দিকে দিকে হিন্দুরা মারা পড়ছিল। ঘরের দরজায় শেকল আটকে নারী ও শিশুদের জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এপার বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সংখ্যালঘু হওয়া প্রায় নিশ্চিত। মাত্র দু'দিনের মধ্যে কলকাতায় ১০ হাজারেরও বেশি হিন্দু প্রাণ দিয়েছিল। কত মা-বোন যে ধর্ষিতা হয়েছিল, কত ঘর যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল তার হিসাব নেই। ইতিহাসে যা 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। সেদিন লালবাজার কলকাতা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে বসে এই হিন্দু-নরসংহার পরিচালনা করছিলেন বঙ্গের তৎকালীন প্রিমিয়ার সৈয়দ সুরাবর্দি এবং কলকাতার রাস্তাঘাটে দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন তার জেহাদি অনুচর মুজিবুর রহমান।

মুজিবুর রহমান! কোন মুজিবুর রহমান? নামটা কেমন চেনা চেনা ঠেকছে তাই না? তিনি কি সেই, যিনি পরবর্তীকালে.......! হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ইনিই সেই বিখ্যাত মুজিবুর, যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে কংগ্রেস আর কমিউনিস্টদের বদান্যতায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন 'বঙ্গবন্ধু' নামে। তিনি ১৯৪৬ সালে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় হিন্দু নিধন যজ্ঞে অংশ নিয়েছিলেন। একথা বিশ্বাস করতে যে মন চাইছে না তাইতো? কিন্তু মন না চাইলেও এটাই সত্যি। বঙ্গের হিন্দু হত্যায় সেদিন তিনিই ছিলেন সুরাবর্দির যোগ্য সঙ্গতকারী। সুরাবর্দি তার জেহাদি গুন্ডাদের আগেই বলে দিয়েছিলেন আগামী দশ দিন যা করার করে নাও, পুলিশ-আর্মি কিছুই করবে না। কাফেরদের হত্যা করার, হিন্দু মেয়েদের যত অত্যাচার করার ইচ্ছা মনে আছে করে নাও। এই ক'দিনে হিন্দু মেজরিটি

ফঃ ২

কলকাতাকে মুসলিম মেজরিটি কলকাতায় রূপান্তরিত করে দাও।

কী ভাবছেন বানানো গল্প? সেদিনের সেই নারকীয় বীভৎসতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি হয়েছিলেন সেই গোলোকবিহারী মজুমদার। তিনি তাঁর প্রবন্ধ— ''৪৬-এর আতঙ্কের দিনগুলি ভুলিনি'তে লিখছেন, ''রাত ১১/১২ টা নাগাদ পাড়ায় ওরা আবার আক্রমণ করলো। দেখলাম একদল লোক, তাদের হাতে ছোরা তরোয়াল ইত্যাদি নানান অস্ত্রশস্ত্র। তারা চিৎকার করছে— আজ তো এক-এক হিন্দুকা কোরবানি করেগা। মা বাবা দিদি আমি ভাগনি সবাই সন্ত্রস্ত। যে কোনো মুহূর্তে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। সবচেয়ে বেশি ভয় দিদিকে নিয়ে। দিদি দেখতে বেশ সুন্দরী। ভাবলাম দিদি হবে ওদের প্রথম টার্গেট। হিন্দু মেয়েদের ওপর ওদের বরাবর লোভ। এদিকে পরিস্থিতি একটু শান্ত হলেও আতঙ্ক যায়নি। ইউনিভার্সিটি খোলা ছিল। রাজাবাজারের উপর দিয়ে আমাকে যেতে হতো। একদিন দেখলাম গোরু কেটে যেমন ঝুলিয়ে রাখে তেমনি ভাবে হাত পা কাটা হিন্দু মেয়েদের চুলে বেঁধে সব ঝুলিয়ে রেখেছে। বীভৎস আর নৃশংস সে দৃশ্য। সেই প্রথম আমি মেয়েদের খোলা উলঙ্গ দেখলাম। গোমাংসের দোকানে যেভাবে লোহার হুকের মধ্যে মাংস ঝুলিয়ে রাখে সেভাবে মাংসের পরিবর্তে মেয়েদের মাথার চামড়ার ভেতর হুক ঢুকিয়ে উলঙ্গ মহিলাদের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।"

কলেজ স্ট্রিটের ৯/৩ টেমার লেন হতে প্রকাশিত 'দর্শক' পত্রিকার সম্পাদক দেবকুমার বসু রচিত '১৯৪৬-এর দাঙ্গার কয়েকটি দিন' নামক প্রবন্ধেও সেদিনের বীভৎসতার উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন--- ''রাজাবাজারের সামনে ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ইস্কুল। মেয়েদের কলেজ ও হোস্টেল একদম ফাঁকা। সকলে পালিয়েছে। কেবলমাত্র রাস্তার দোতালার জানলায় চারিটি মেয়েকে হত্যা করে রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে কে বা কারা।" এমনকী একদা পাকিস্তানের দাবির কট্টর সমর্থক কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন— ''১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশনে কলকাতায় মৃতের সংখ্যা ২০ হাজারের কম হবে না।"

এরকম অসংখ্য দৃশ্য ছিল ১৯৪৬-এর কলকাতা জুড়ে। তবে এর মধ্যেও কিছু মানুষ এর প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। কলকাতার বৌবাজার এলাকার মলঙ্গা লেনের বীর বাঙ্গালি যুবক গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুসলমানদের প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিতে সামনে এগিয়ে এলেন। ১৮ আগস্ট থেকে হিন্দুরা প্রতিরোধে নামল। গোপাল মুখার্জি সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দুকে একত্রিত করে জেহাদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' নামে তাঁর যে সংগঠনটি ছিল, তার পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক, যারা ছিল বিভিন্ন আখড়ার ব্যায়ামবীর কুস্তিগির, তাদের নিয়ে তিনিই প্রথম হিংস্র জেহাদিদের বিরুদ্ধে পালটা প্রতিরোধে নেমেছিলেন। তিনি সেদিন আপন বুদ্ধি আর পরাক্রমের বলে প্রায় একাই মুসলিম লিগের ইচ্ছায় জল ঢেলে রুখে দিয়েছিলেন হিন্দু নরসংহার। রক্ষা করেছিলেন হিন্দু মা-বোনের সম্ভ্রম। নিরীহ হিন্দুদের মরতে দেখে এবং পুলিশকে মূক দর্শক হয়ে থাকতে দেখে তিনি দলের কর্মীদের প্রতিশোধ নেওয়ার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন— 'যদি লড়াই-ই হয় তবে যুদ্ধবাজের সঙ্গে শান্তিদূতের কেন? লড়াই হোক আগুনের সঙ্গে আগুনের, তলোয়ারের সঙ্গে তলোয়ারের, নৃশংসতার সঙ্গে নৃশংসতার। এবার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সময় এসে গেছে। তোমরা যদি একজন হিন্দুকে মরতে দেখো তবে দশজন অত্যাচারীকে মারো!'

জেহাদিরা এই প্রথম হিন্দুর সাহস ও শক্তির পরিচয় পেল। বিপ্লবী বীর গোপাল মুখার্জির নেতৃত্বে 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' হিন্দু পাড়ায় ঢুকে হিন্দু হত্যা করতে আসা জেহাদিদের দমন করা শুরু করলো। তার সঙ্গে সঙ্গে সে লড়াই পৌঁছে গেল জেহাদিদের পাড়ায় পাড়ায়। মুসলিম লিগের 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড'-এর কয়েকশো জেহাদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলো দোজখের দোরগোড়ায়। গত দু'দিন ধরে যে জেহাদিরা হিন্দু এলাকায় ঢুকে ঢুকে হিন্দু মা-বোনের উপর অকথ্য অত্যাচার করছিল, হত্যার তাণ্ডব চালাচ্ছিল, বিপ্লবী গোপাল মুখার্জির বাহিনী তাদের খুঁজে খুঁজে নরকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিল। এতদিন মিয়াভাইদের ধারণা ছিল জেহাদিরা খুব সাহসী আর বাঙ্গালিরা হিন্দু ভীরু দুর্বল। ১৮ আগস্ট থেকে তাদের সেই ভ্রম দূর হয়ে গেল। যখন দেখা গেল বিপ্লবী গোপাল মুখার্জির সৈনিকদের প্রতাপে জেহাদিদের বাঁচা দুষ্কর হয়ে উঠেছে, তখন সুরাবর্দির টনক নড়লো। যে সুরাবর্দি লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোলরুমে বসে দু'দিন ধরে পুলিশকে অ্যাকশন নিতে আটকে রেখেছিল, সেই সুরাবর্দি প্রতিরোধ থামাতে ব্যগ্র হয়ে উঠলো। জাতভাইদের বাঁচাতে সে তার দুই খাস শাগরেদ জি জি আজমীর ও শেখ মুজিবুর রহমানকে সমঝোতার জন্য পাঠালো বিপ্লবী গোপাল মুখার্জির কাছে । তারা সেদিন গোপাল মুখার্জির কাছে রীতিমতো আকুতি জানিয়ে বলেছিল— 'দয়া করে এই প্রতিরোধ বন্ধ করো, আমাদের মেরো না, মাফ করে দাও।' গোপাল মুখার্জি সেদিন তাদের মাফ করে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে— আগে মুসলিম লিগ হিন্দুদের ওপর আক্রমণ বন্ধ করুক, তবেই আমরা থামবো। অসীম সাহসী, বীর ও বুদ্ধিমান গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিন্তু সেদিন শত্রুদের মুখের কথায় তাঁর বাহিনীকে নিরস্ত করেননি। আগে জেহাদিরা রণে ভঙ্গ দিয়েছে, তারপর তিনি তার বীর যোদ্ধাদের নিরস্ত করেছেন।

শুধু কলকাতায় নয়, তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবেও ঘটেছিল একই রকম চরম হত্যালীলা। ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন অবিভক্ত বঙ্গের নোয়াখালী আর কুমিল্লায় জেহাদি আক্রমণে প্রাণ গিয়েছে কয়েক হাজার হিন্দুর। বর্বর মুসলিম লিগের জেহাদিদের হাতে কত মা-বোন যে ধর্ষিতা

হয়েছ, এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, জহরব্রত অবলম্বন করে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখিকা, সমাজ বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী উর্বশী বুতালিয়া তাঁর গবেষণালব্ধ বই 'দ্য আদার সাইড অফ সাইলেন্সস— ভয়েসেস ফ্রম দ্য পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া' বইতে লিখেছেন— 'শুধু পশ্চিম পঞ্জাব থেকে ধর্ষণের ফলে ৭৫ হাজার গর্ভবতী হিন্দু-শিখ কুমারীকে উদ্ধার করে এনে দিল্লির করোলবাগের কাপুর হাসপাতালে সেদিন গর্ভপাত করানো হয়েছিল। আর লিগের গুন্ডাদের ধর্ষণের ফলে যারা গর্ভবতী হয়েছিল কিন্তু সময়মতো গর্ভপাত করানো যায়নি, এমন ৫০ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছিল এবং এদের গোপনে হত্যা করা হয়েছিল।'

আর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্ব শান্তির অতন্দ্র প্রহরী এক নেতা সেদিন জেহাদি আক্রমণে মৃতপ্রায় হিন্দুকে অহিংসার আদর্শ ধরে থাকার জ্ঞান দিয়েছিলেন। উপদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন হত্যাকারী ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে না তোলে। কলিকাতা-নোয়াখালীর ধর্ষিতা নারীদের উপদেশ দিয়েছিলেন— 'তাঁরা যেন দাঁতে দাঁত চেপে ধর্ষণ সহ্য করে। নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে না পারলে তারা আত্মহত্যা করুক, কিন্তু তারা যেন এর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে না নেয়, সশস্ত্র প্রতিরোধ না করে।'

পরের বছর ১৯৪৭-এ যখন বঙ্গের নোয়াখালী ও অন্যান্য প্রান্তে জেহাদিরা পুনরায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করল তখন তা রুখতে ওই 'মহাত্মা' এই বঙ্গে এসেছিলেন। সাংবাদিক শালিনী চ্যাটার্জি তাঁর বইতে লিখেছেন— লোকজন (হিন্দু) সেদিন নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র গান্ধীজীর পায়ে সমর্পণ করছিল। বলছিল বাপু, আজ থেকে আমরা আর হিংসার আশ্রয় নেব না। লোকে নিজের চাকু, তলোয়ার, পিস্তল সব গান্ধীর পায়ে সঁপে দিচ্ছিল। মাউন্টব্যাটেন একে 'গান্ধীর চমৎকার' বলে অভিহিত

> **বাঙ্গালি হিন্দু, বিশেষত উন্নাসিক সেকুলার, বামপন্থী ও তথাকথিত ভদ্রলোকেরা তাদের অস্তিত্বের জন্য চিরকালই বিপ্লবী গোপাল মুখার্জির কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। কারণ বিপ্লবী গোপাল মুখার্জিই তাদের মা-বোন, পূর্বপুরুষদের জেহাদি সুরাবর্দি ও জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।**

করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গান্ধীবাদী হলেন না। তিনি কোনো অস্ত্র সমর্পণ করলেন না। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন— 'গান্ধীজী আমাকে দু'দু বার ডেকেছিলেন। আমি যাইনি। তৃতীয়বার এক স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অনুরোধ করে বলেছিল অন্তত একটা-দু'টো অস্ত্র জমা করে দাও। তখন আমি ওখানে গেলাম। দেখি কিছু লোক নিজের জং ধরা বাতিল হাতিয়ার জমা করছিল। গান্ধীজীর সেক্রেটারি আমাকে বললেন— তুমিও তোমার অস্ত্র গান্ধীজীর কাছে সারেন্ডার করো। আমি বললাম— যে অস্ত্র দিয়ে আমি হিন্দু মা-বোনের সম্মান বাঁচিয়েছি, হিন্দুদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছি, এ অস্ত্র আমি গান্ধীজীর পায়ে সারেন্ডার করতে পারবো না। গান্ধীজী দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্-এর সময় কোথায় ছিলেন? যখন হিন্দুর ঘর বাড়ি জ্বলছিল, মানুষ খুন হচ্ছিলো, মা বোনের সর্বনাশ চলছিল, তখন গান্ধীজী নয়, এই অস্ত্রই তাঁদের রক্ষা করেছে। যদি আমি একটা গাছের ডাল দিয়েও হিন্দুর প্রাণ বাঁচিয়ে থাকি, সেটাও ওর পায়ে সারেন্ডার করতে পারবো না, হাতিয়ার তো দূর।'

বিপ্লবী গোপাল মুখার্জির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর সেই ঘোর দুর্দিনে আরও দু'জন ব্যক্তি হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা হলেন ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর গুরু ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তাঁরা সেসময় কলকাতা, নোয়াখালীতে ঘুরে ঘুরে হিন্দুদের মনে সাহস জুগিয়েছিলেন। তারপর অবশেষে ১৯৪৭-এ ব্রিটিশের চক্রান্ত, জিন্নার হিন্দু নিধন আর জওহরলালের চটজলদি সিংহাসনে বসার উদগ্র বাসনা— এই তিন মিলেমিশে দেশভাগ যখন প্রায় নিশ্চিত, সেই সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালি জাতিকে ধ্বংসের দোরগোড়া থেকে বাঁচিয়ে এনেছিলেন। তাঁর অদম্য লড়াইয়ের ফলে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন আত্মপ্রকাশ করেছিল এক নতুন রাজ্য, ভারতের বুকে হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড আজকের পশ্চিমবঙ্গ।

কিন্তু স্বাধীনতার পরে আমাদের ধূর্ত, কৃতঘ্ন শাসকেরা বীর, হিন্দু-রক্ষক গোপাল চন্দ্র মুখার্জিকে বাঙ্গালির মন থেকে মুছে দিল। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই হয়নি তাঁর। হাজার হাজার হিন্দুর প্রাণরক্ষাকারী বাঙ্গালি বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আজও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কাছে, কলকাতাবাসীর কাছে নামগোত্রহীন ও একপ্রকার ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন। অস্বীকার করলেও বাঙ্গালি হিন্দু, বিশেষত উন্নাসিক সেকুলার, বামপন্থী ও তথাকথিত ভদ্রলোকেরা তাদের অস্তিত্বের জন্য চিরকালই বিপ্লবী গোপাল মুখার্জির কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। কারণ বিপ্লবী গোপাল মুখার্জিই তাদের মা-বোন, পূর্বপুরুষদের জেহাদি সুরাবর্দি ও জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে— যারা নিজেদের ইতিহাস মনে রাখে না, তারা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে বাধ্য হয়। ১৯৪৬-এর সেই দুর্দিনের ইতিহাস ও তার ত্রাণকর্তা এই তিন বীর মহাপুরুষকে ভুলে গেলে বাঙ্গালি হিন্দুর আবার ১৯৪৬-এর পরিণতি হবে। □

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং ভগিনী নিবেদিতার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

ডঃ বিবেকানন্দ চক্রবর্তী

ভগিনী নিবেদিতা বিদেশি রমণী হয়েও ভারতবর্ষকে নিজের মাতৃভূমি হিসেবে বরণ করেছিলেন এবং এই দেশের মুক্তির জন্য নিজের জীবন তিলে তিলে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের এক জ্বলন্ত 'শিখাময়ী'

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্ব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পটপরিবর্তনের সাক্ষী। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দিকের রাজনীতি মূলত আবেদন-নিবেদন ও সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যা ইতিহাসে 'নরমপন্থী' নামে পরিচিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে, বিশেষত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ জাতীয়তাবাদীর মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি গভীর মোহভঙ্গ ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় চরমপন্থী বা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ছিল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন। বঙ্গের বুকে এই সশস্ত্র বিপ্লবের যে স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হয়েছিল, তার নেপথ্যে অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক, সংগঠক ও চালিকাশক্তি ছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল— যিনি ভারতবাসীর কাছে ভগিনী নিবেদিতা নামে সুপরিচিত।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হিসেবে তাঁর আধ্যাত্মিক ও শিক্ষামূলক অবদানের কথা বহুল চর্চিত হলেও, ভারতের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির বিস্তারে, মতাদর্শগত ভিত্তি নির্মাণে এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ আইনি ও কাঠামোগত সহায়তায় তাঁর ভূমিকা ছিল অভাবনীয় ও সুদূরপ্রসারী।

লন্ডনে ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেট নোবেলের প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ বদলে দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন এবং ভারতের শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা মার্গারেটকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের, বিশেষত ভারতীয় নারীদের জাগরণের জন্য মার্গারেটের মতো একজন সিংহহৃদয় নারীর প্রয়োজন। ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে মার্গারেট ভারতে পদার্পণ করেন এবং ২৫ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নতুন নামকরণ করেন 'নিবেদিতা' বা 'The Dedicated One'।

প্রাথমিক পর্যায়ে নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ ও ভারতের মধ্যে একটি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু অচিরেই ঔপনিবেশিক শোষণের নগ্ন রূপ তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করে। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় মহামারী আকারে প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দিনরাত এক করে রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ প্রশাসনের চরম অবহেলা ও বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। বড়লাট কার্জনের স্বৈরতান্ত্রিক নীতি, বিশেষত ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Indian Universities Act) এবং ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal) তাঁকে গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ করে।

বড়লাট কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যখন ভারতীয়দের সত্যবাদিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং তাঁদের 'মিথ্যাবাদী' আখ্যা দেন, তখন নিবেদিতা তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি কার্জনেরই লেখা একটি বই থেকে প্রমাণ করে দেন যে কার্জন স্বয়ং কোরিয়ার সম্রাটের কাছে মিথ্যা কথা বলে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করেছিলেন। এই নির্ভীক প্রতিবাদ নিবেদিতাকে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের কাছে এক অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া যখন ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করে, তখন নিবেদিতা ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী ধর্ম ও সমাজসেবার বাইরে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে

অংশগ্রহণ করা সন্ন্যাসীদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। নিবেদিতার রাজনৈতিক তৎপরতা ও বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরে এলে রামকৃষ্ণ মিশন ব্রিটিশ রোষানলে পড়ার ঝুঁকিতে পড়ে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে এবং নিবেদিতার নিজস্ব দূরদর্শিতায় ১৯০২ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নিজের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

তবে এই বিচ্ছেদ ছিল নিতান্তই কৌশলগত। শ্রীমা সারদা দেবী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর আমৃত্যু নিবিড় আধ্যাত্মিক ও আত্মিক সম্পর্ক বজায় ছিল। সারদা দেবী স্বয়ং নিবেদিতার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে আশীর্বাদ করতেন এবং তাঁর প্রতি অগাধ বাৎসল্য পোষণ করতেন। মিশন থেকে আনুষ্ঠানিক মুক্তির পর নিবেদিতা তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে, বিশেষত সশস্ত্র বিপ্লবের পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন।

১৯০২ সালে বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী বছর। এই বছরেই প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) সতীশচন্দ্র বসু এবং জাপানি দার্শনিক কাকুজো ওকাকুরার পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। দৃশ্যত এটি একটি শরীরচর্চা কেন্দ্র বা আখড়া হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য তরুণদের শারীরিক, মানসিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

অনুশীলন সমিতির প্রাথমিক রূপকার ও প্রথম সারির সংগঠকদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি এই সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যা ছিলেন। নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রভাব, আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং দার্শনিক অনুপ্রেরণা অনুশীলন সমিতির তরুণ সদস্যদের মধ্যে এক অভুতপূর্ব বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করেছিল।

নিবেদিতা তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন বৈপ্লবিক গ্রন্থ, বিশেষত আয়ারল্যান্ড ও রাশিয়ার বিপ্লব সংক্রান্ত নথিপত্র অনুশীলন সমিতির তরুণদের পড়তে দিতেন। তিনি তাঁদের বোঝাতেন যে কেবলমাত্র শরীরচর্চা নয়, প্রয়োজন দেশের জন্য আত্মবলিদানের মানসিকতা। ১৯০১ সালে প্রকাশিত তাঁর রচিত 'Kali the Mother' নামক গ্রন্থটি চরমপন্থী বিপ্লবীদের কাছে একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থের রূপ ধারণ করেছিল। এই গ্রন্থে তিনি মা কালীকে ধ্বংস ও সৃষ্টির এক অখণ্ড শক্তিরূপে কল্পনা করেন, যা বিপ্লবীদের মনে ভয়হীনতার জন্ম দেয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'ভারতমাতা' চিত্রকল্পের নেপথ্যেও এই গ্রন্থের গভীর প্রভাব ছিল।

বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক সখ্য এক অনন্য ও অত্যন্ত প্রভাবশালী অধ্যায় রচনা করেছিল। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯০২ সালের শেষদিকে, বরোদায়। নিবেদিতা যখন বরোদায় পৌঁছান, তখন তিনি শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' বইটি উপহার দেন এবং তাঁকে বঙ্গে ফিরে এসে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতাকে একজন অগ্নিকন্যা হিসেবে সম্মান করতেন এবং তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'শিখাময়ী'। অরবিন্দ বরোদায় বসে একটি গুপ্ত বিপ্লবী কমিটি গঠন করেছিলেন, যাতে ভারতের ভবিষ্যৎ সশস্ত্র সংগ্রামের রূপরেখা তৈরি করা যায় এবং বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। এই গোপন কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সদস্য ছিলেন নিবেদিতা। তাঁদের এই সম্পর্কের ভিত্তি আধ্যাত্মিকতার চেয়ে রাজনৈতিক বেশি ছিল। অরবিন্দ নিজেই স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর আলোচনা মূলত রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘিরেই আবর্তিত হতো।

শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার 'Kali the Mother' বইটি পড়ে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং উপলব্ধি করেন যে এই বইয়ের দর্শনকে ব্যবহার করে তরুণ বিপ্লবীদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। অন্যদিকে নিবেদিতাও শ্রীঅরবিন্দের মেধা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় মুগ্ধ ছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সাংবাদিক এস.কে. র‍্যাটক্লিফের কাছে একটি চিঠিতে 'বঙ্গের ম্যাজিনি' বলে উল্লেখ করেছিলেন, যা শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বের প্রতি নিবেদিতার অটল আস্থার পরিচায়ক।

এই যুগলবন্দির সবচেয়ে নাটকীয় ও কৌশলগত পর্যায়টি দেখা যায় ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে নিবেদিতা তাঁর উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ পরিচিতদের (যাঁরা ব্রিটিশ প্রশাসনে কর্মরত ছিলেন) কাছ থেকে গোপনে খবর পান যে ব্রিটিশ প্রশাসন শ্রীঅরবিন্দকে নির্বাসনে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। তিনি দ্রুত এই খবর অরবিন্দকে জানান এবং তাঁকে সতর্ক করেন। অরবিন্দের গ্রেপ্তার ঠেকাতে নিবেদিতার পরামর্শেই অরবিন্দ তাঁর সম্পাদিত 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় ১৯০৯ সালের ৩১ জুলাই তাঁর বিখ্যাত 'Open Letter to My Countrymen' (দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি) প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে তিনি ব্রিটিশ আইনের সীমানার মধ্যে থেকে অত্যন্ত সুকৌশলে ভারতের পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুলে ধরেন, যা ব্রিটিশদের নির্বাসনের আইনি পথকে রুদ্ধ করে দেয়।

পরবর্তীকালে, ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীঅরবিন্দ যখন ব্রিটিশ পুলিশের নজর এড়িয়ে চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরিতে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন, তখন তিনি তাঁর 'কর্মযোগিন'-এর সম্পাদনার ভার ভগিনী নিবেদিতার হাতে তুলে দেন। শ্রীঅরবিন্দ যে ব্রিটিশ ভারতের সীমানার বাইরে চলে গেছেন, এই সত্যটি সযত্নে গোপন রেখে নিবেদিতা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পাদনা অব্যাহত রাখেন। এই পত্রিকায় নিবেদিতা স্বয়ং একাধিক সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, যেখানে তিনি ভারতের অবিভাজ্য জাতীয়তার কথা জোরালোভাবে প্রচার করেন এবং জাতীয় ঐক্যের ওপর জোর দেন।

সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য কেবলমাত্র আদর্শগত অনুপ্রেরণা বা রাজনৈতিক প্রচারই যথেষ্ট ছিল না, প্রয়োজন ছিল আধুনিক অস্ত্র ও বিস্ফোরকের। এই ক্ষেত্রে নিবেদিতার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক। আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী পটভূমি এবং রাশিয়ান নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে বোমা তৈরি, গেরিলা যুদ্ধ এবং গুপ্তচরবৃত্তির কৌশল সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল।

অনুশীলন সমিতি ও পরবর্তীকালে যুগান্তর দলের তরুণ বিপ্লবীরা যখন লাঠি ও ছোরার বদলে বোমা তৈরির প্রযুক্তি খুঁজছিলেন, তখন

নিবেদিতা তাঁদের রাশিয়ান বিপ্লবীদের ব্যবহৃত ফরাসি ভাষায় লেখা বোমা তৈরির ফর্মুলা সরবরাহ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের একাংশ মনে করেন। শুধু তাই নয়, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে নিবেদিতার অবাধ যাতায়াত ছিল। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী অবলা বসুর সঙ্গে নিবেদিতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিবেদিতা বিদ্যালয় ও কলেজের গবেষণাগার থেকে বোমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ গোপনে সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতেন বলে একাধিক ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

কেবলমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি জাতিকে স্বাধীন হতে হলে তাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিকভাবেও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্যে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দেন এবং ছাত্রদের স্বদেশী শিল্প ও চরকা ব্যবহারের অনুপ্রেরণা জোগান। তিনি ডন সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে 'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ভারতের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে তিনি তরুণ বিপ্লবীদের জাপান, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় পাঠিয়ে আধুনিক কারিগরি বিদ্যা, ফার্মাসিউটিক্যালস, কাচ শিল্প এবং ধাতব শিল্প শিক্ষার জন্য তহবিল গঠন করেছিলেন। দেশজুড়ে ভ্রমণ করে তিনি কলকাতা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে তরুণ সমাজের সামনে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে উদ্বুদ্ধ করেন। ভারতীয় শিল্পকলার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসুর মতো শিল্পীদের ক্রমাগত উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে ভারতীয় শিল্প কোনো অংশেই ইউরোপীয় শিল্পের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।

একজন শ্বেতাঙ্গ ও ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার কারণে নিবেদিতা কিছু আইনি ও সামাজিক বাড়তি সুবিধা পেতেন। ব্রিটিশ পুলিশ সহজে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে বা তাঁকে বিনা প্রমাণে গ্রেপ্তার করতে সাহস পেত না। তিনি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তাঁর এই পরিচয়ের আড়ালে বিপ্লবীদের সুরক্ষা দিতেন। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক এবং স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন, তখন নিবেদিতা আদালতে তাঁর জামিনদার হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ব্রিটিশের রোষানল থেকে তাঁকে বাঁচাতে নিবেদিতাই তাঁকে গোপনে আমেরিকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বহু বিপ্লবীর নিরাপদ আত্মগোপনের স্থান ছিল নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িটি।

একজন শ্বেতাঙ্গ নারী হয়েও ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভগিনী নিবেদিতার এই প্রকাশ্য ও গোপন বিদ্রোহ ব্রিটিশ প্রশাসনকে হতবাক ও শঙ্কিত করেছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স এবং ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর তীক্ষ্ণ নজরদারি শুরু করে। চার্লস টেগার্টের মতো দুর্ধর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা নিবেদিতার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টগুলিতে তাঁকে প্রায়শই একজন 'রাজনৈতিক সাধ্বী' বা বিপজ্জনক চরমপন্থী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালীন ব্রিটিশ আমলারা বিশেষত বড়লাট কার্জন এবং পরবর্তী ভাইসরয়রা তাঁকে ও শ্রীঅরবিন্দকে ভারতের অন্যতম 'বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ' হিসেবে গণ্য করতেন।

এই অত্যধিক পরিশ্রম, অবিরাম গোয়েন্দা নজরদারির মানসিক চাপ, প্লেগ এবং পূর্ববঙ্গের বন্যায় অমানুষিক সেবাকাজ নিবেদিতার স্বাস্থ্যকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। ১৯০৫ সালে মেনিনজাইটিস এবং ১৯০৬ সালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজের শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করেও তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত হননি। নিজের লেখা বহু চিঠিপত্রে, বিশেষ করে জোসেফাইন ম্যাকলাউড এবং মিসেস বুলের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর মানসিক টানাপোড়েন এবং কাজের প্রতি নিবেদিত প্রাণ সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশেষে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর, দার্জিলিঙে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এবং লেডি অবলা বসুর আশ্রয়ে থাকা অবস্থায় মাত্র ৪৪ বছর বয়সে এই অগ্নিকন্যার জীবনাবসান ঘটে। দার্জিলিঙে তাঁর সমাধিলিপিতে লেখা হয় এক ঐতিহাসিক ও মর্মস্পর্শী বাক্য— 'Here reposes Sister Nivedita who gave her all to India'।

ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে কেবলমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের একজন আধ্যাত্মিক শিষ্যা বা নারীশিক্ষার প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবিকার বৃত্তে আবদ্ধ রাখা ঐতিহাসিক সত্যের চরম অপলাপ। তথ্য-প্রমাণ, গোয়েন্দা রিপোর্ট ও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের এক প্রচ্ছন্ন অথচ সর্বব্যাপী স্থপতি।

তাঁর আইরিশ রক্ত, তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে ভারতের মতো একটি প্রাচীন ও বিশাল সভ্যতার দেশকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হলে নিছক রাজনৈতিক আবেদন-নিবেদন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন এক সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রাম এবং মহর্ষি দধীচির মতো নিঃস্বার্থ আত্মবলিদান। শ্রীঅরবিন্দের মতো তাত্ত্বিক নেতাকে বঙ্গের রাজনৈতিক রণভূমিতে অবতীর্ণ করা থেকে শুরু করে, অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের তরুণদের মতাদর্শগত প্রশিক্ষণ দেওয়া, 'কর্মযোগিন' পত্রিকা সম্পাদনা করে ব্রিটিশদের বিভ্রান্ত করা, এমনকী বোমা তৈরির রাসায়নিক জোগাড় করা— সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতিটি স্তরেই নিবেদিতার মেধা, কৌশল এবং অসীম সাহসিকতার ছাপ স্পষ্ট।

একজন বিদেশি রমণী হয়েও তিনি ভারতবর্ষকে নিজের মাতৃভূমি হিসেবে বরণ করেছিলেন এবং এই দেশের মুক্তির জন্য নিজের জীবন তিলে তিলে উৎসর্গ করেছিলেন। নিবেদিতা ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের এক জ্বলন্ত 'শিখাময়ী', যাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বৈপ্লবিক দর্শন এবং বজ্রকঠিন সংকল্প পরবর্তী প্রজন্মের অগণিত মুক্তিযোদ্ধাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

(লেখক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বটুকৃষ্ণ হালদার

বামপন্থীরা প্রায়শই কথায় কথায় বলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কতটুকু ভূমিকা ছিল? সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন আছে স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের কী ভূমিকা ছিল? সেই সময়ে সঙ্ঘের ভূমিকা ছিল বলেই আজ সমাজ সঙ্ঘকে গ্রহণ এবং মিথ্যা ও অপপ্রচারের জন্য বামপন্থীদের প্রত্যাখ্যান করেছে।

নাগপুরের বিদর্ভ থেকে তরুণ ছাত্র কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার যখন ১৯১০ সালে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এলেন, তখন তিনি শুধু চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করতে আসেননি, জাতীয়তাবোধের অগ্নিস্রোতও তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। অনুশীলন সমিতি, বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশ আর সেই সময়কার যুবসমাজের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির পথ।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে দেশের যেখানে যেখানে সঙ্ঘের যতটুকু শক্তি সামর্থ্য ছিল, তা নিয়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ জেলার চিমূরে শাখার মুখ্যশিক্ষক রমাকান্ত দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে স্বয়ংসেবকরা আন্দোলনে অংশ নেয়, সেখানে পুলিশের গুলি চলে। সত্যাগ্রহীদের মৃত্যু হয়, স্বয়ংসেবকদের কারাবাস হয়। সঙ্ঘের কার্যবাহ দাদা নায়েকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়।

সঙ্ঘের সঙ্গে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা উভয় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সুসম্পর্ক ছিল। মুসলিম লিগ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতো রাজনৈতিক দলগুলি ১৯৪২-এ কংগ্রেসের ডাকা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল।

সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের বেশ কিছুটা অংশ গান্ধীজীর নেতৃত্বে কেটেছে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশের অনুশীলন সমিতি যেমন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, তেমনই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও গান্ধীজীর নেতৃত্বও তাঁকে টেনেছিল। ১৯১৫ সালে তাঁর ডাক্তারির ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ হয়েছিল। গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়েই ডাঃ হেডগেওয়ার ১৯২১ সালে কারাবরণ করেন।

১৯২২ সালে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নাগপুরে বিশাল জনসভা হয়। সেখানে ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁকে 'পূজ্যপুরুষ' বলে সম্বোধন করেন। ডাঃ হেডগেওয়ারের ভাষায়— গান্ধীজীর কথায় ও কাজে কোনও অন্তর নেই। সেদিনের খদ্দরের পোশাক আর গান্ধীটুপি পরা যুবকটিই ১৯২৫ সালে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯২৯ সালের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে যখন পূর্ণস্বরাজের ডাক এল তখন ডাক্তারজী ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রত্যেক শাখায় ভারতের তৎকালীন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। মধ্য ভারতে সমুদ্র নেই, তাই সেখানে জঙ্গল সত্যাগ্রহ চলেছিল। ডাক্তারজী সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব সাময়িকভাবে ডাঃ পরাঞ্জাপকে অর্পণ করে সত্যাগ্রহ করেন এবং কারাবরণ করেছিলেন। গান্ধীজীর ডাকে সেদিন ডাঃ হেডগেওয়ার ১৯৩০ সালের ২১ জুলাই থেকে ১৯৩১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কারান্তরালে ছিলেন।

১৯৩৪ সালে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধাতে সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ শিবিরে গান্ধীজী

গিয়েছিলেন। এটি কেবল সঙ্ঘের দাবি নয়, তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর বক্তৃতাতে এর উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, দেশভাগের পরেও গান্ধীজীর সঙ্গে সহজ সরল সম্পর্ক ছিল স্বয়ংসেবকদের। স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই ১৯৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দিল্লির ভাঙ্গিকলোনিতে সঙ্ঘের প্রায় ৫০০ জন কার্যকর্তার একটি সভাতে বক্তব্য রেখেছিলেন গান্ধীজী। সেখানে তিনি বলেন— 'আমি ওয়ার্ধাতে বহুদিন আগে আরএসএস-এর একটি ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। তখন প্রতিষ্ঠাতা শ্রী হেডগেওয়ার জীবিত ছিলেন। শ্রী যমুনালাল বাজাজ আমাকে শিবির দেখতে নিয়ে গেছিলেন। আমি তাদের কঠোর অনুশাসন, অস্পৃশ্যতামুক্ত ব্যবস্থা আর সরলতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।' (কালেকটেড ওয়ার্কস্ অফ মহাত্মা গান্ধী, সেকশন ৮৯, পৃষ্ঠা ১৯৩,১৯৪)।

এই মূল বক্তৃতা দেখলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি গান্ধীজী কী ভাব পোষণ করতেন তা সহজেই বোঝা যায়। এর জন্য রামচন্দ্র গুহর বিষোদ্গার ঘাঁটতে হবে কেন? সেখানে গান্ধীজী জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘের আপোশহীন লড়াই আর দেশপ্রেমের প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

দেশভাগ অপরিহার্য ছিল, নাকি কংগ্রেসের কতিপয় নেতৃত্বের ক্ষমতার মধুর লোভে হঠকারিতার খেসারত, তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনতার পরেও দেশে ফিরিয়ে না আনার কারণ কী? সেই উত্তর নেহরু সরকারের চাপরাশ যাঁরা বহন করছেন তাদের তো দিতেই হবে। ঠিক তেমনই কোনো প্রমাণ ছাড়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৮১৮' প্রয়োগ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো সংগঠনকে ১৯৪৮ সালে নিষিদ্ধ করা, ৮০ হাজার স্বয়ংসেবককে কারাগারে নিক্ষেপ করা বা প্রতিশোধের নামে মহারাষ্ট্রে একের পর নিরপরাধ হিন্দু ব্রাহ্মণদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার হিসাব তো নেহরু সরকারের স্তাবকদের কাছে আগামী ভারতবর্ষ চাইবেই। গান্ধীজীর নিরাপত্তার বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থার সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও নেহরু সরকারের কী ভূমিকা ছিল? গান্ধীজীর নশ্বর দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট কেন প্রকাশিত হলো না? এরকম প্রশ্ন বহু দেশকে আজও ভাবায়। তবে একদিন এসব অজানা রহস্য সত্যিই উন্মোচন হবে এমনটা আশা করা যায়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোনো প্রামাণ্য লেখাতে গান্ধীজী বিরোধিতা নেই। গান্ধী-বিরোধিতা এক কালে কমিউনিস্টদের মধ্যে ছিল অত্যুগ্র। গান্ধীজীর প্রতি কমিউনিস্টদের চরম ঘৃণা ফুটে উঠেছে রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভলগা থেকে গঙ্গা' গ্রন্থে। 'সফদর' আখ্যানে সেই ঘৃণা ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত। সঙ্ঘ সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের অপপ্রচার ও দেশদ্রোহিতার চিন্তাধারা মূর্খতার পরিচয় বহন করে। কারণ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ জানে কমিউনিস্ট মাত্রেই দেশদ্রোহী, জঙ্গিবাদের উৎসাহদাতা। আর সঙ্ঘ জন্ম দেয় রাষ্ট্রবোধের।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রথম জন-আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন গান্ধীজী। তার প্রতীক ছিল চরকা। কিন্তু কমিউনিস্ট ব্যাখ্যাতে 'কলকারখানার যুগ ছেড়ে তাঁর অতীতে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা— প্রতিবিপ্লবী বিচ্যুতি।' 'সুমের' আখ্যানে গান্ধীজীর প্রতি ঘৃণা আরও স্পষ্ট উদ্গিরণ হয়েছে। কমিউনিস্টদের একটি দলিলে উল্লেখিত হয়েছে— 'সেবাগ্রাম থেকে প্রলম্বিত অন্ধকারে যে-সব সমাজবাদীদের অস্তিত্ব তাদের অভিভাবক শয়তান। হিটলারও নিজেকে সমাজবাদী বলে গান্ধীর চেলারাও।'

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গবিভাগ করার কথার উল্লেখ আসলে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি। ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগ না হলে অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানে চলে যেত এবং সেক্ষেত্রে হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব লুপ্ত হতো।

সেই সময় বঙ্গবিভাগ করে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের লড়াইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ব্যক্তিত্বরাও ছিলেন। তাঁরা কেউ শ্যামাপ্রসাদের দল বা মতের সমর্থক ছিলেন না কিন্তু হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগ করার পক্ষে ছিলেন। যেহেতু এই আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল হিন্দু মহাসভা। তাই জিন্না এই বঙ্গবিভাগ এবং কলকাতা হাতছাড়া হওয়ার জন্য কেবলমাত্র হিন্দু মহাসভাকে দোষারোপ করতেন। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে জিন্না দিল্লিতে একাধিক বক্তৃতাতে এই নিয়ে আক্ষেপ করেছেন।

আজ বোঝা যায় সেদিন বঙ্গবিভাগ করে যদি 'পশ্চিমবঙ্গ' তৈরি না হতো, তবে আজ বাঙ্গালি জাতির বা ওই কমিউনিস্ট লেখকদের কী অবস্থা হতো? হয় সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানে যেত নতুবা অখণ্ড ইসলামি দেশ তৈরি হতো। এই দুই পরিস্থিতিতে তাদের (কমিউনিস্টদের নেতাদের) মতো বিদগ্ধ, দেশপ্রেমিক রাজপুরুষেরা (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়'-এর ভাষায়) কী মর্যাদা পেতেন বা আজ তাদের কী ভূমিকা থাকতো সেটা কেউ ভেবে দেখেছেন? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে যাঁরা গর্ব অনুভব করেন, তাঁদের অবস্থা কি হতো সেই পূর্ব পাকিস্তান বা অখণ্ড ইসলামিক বঙ্গে? তবে কমিউনিস্টরা নিজেদের স্বার্থে কখন কীভাবে গিরগিটির থেকেও দ্রুত রং বদলাবে সেটা বোঝা মুশকিল।

বিপ্লবী বীর সাভারকর, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা ভারতবর্ষকে ভাঙতে চাননি। তাঁরা 'অখণ্ড ভারত' চেয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের কথাতেই অখণ্ড ভারতের সংকল্পপত্র রচনা করেছিলেন। সেটি ১৯৪৫ সালে লক্ষ্ণৌয়ের 'হিন্দ কিতাব' থেকে প্রকাশিতও হয়েছিল। এইসব সত্য লুকিয়ে কেবল ১৯৪৭-এর বঙ্গবিভাগের কথা বললে, সেটি এক প্রকারের অসত্য ভাষণ হয়। শিক্ষিত মানুষ সমাজের সঙ্গে প্রতারণা করলে অনেক বেশি ক্ষতির সম্ভবনা থেকে যায়।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা গৈরিক করা হোক— এমন প্রস্তাব তো বহু মনীষীই দিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা গৈরিক পৃষ্ঠভূমিতে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার নকশা করেছিলেন। তার মাঝে একটি বজ্র চিহ্ন আর নীচে বাংলা হরফে লেখা 'বন্দে মাতরম্'। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার প্রতি স্বাধীন ভারতে সকলের মতো সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদেরও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে। স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশের সর্বত্র সঙ্ঘের শাখায় ও কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে উত্তোলিত হয়।

তাই যারা সঙ্ঘের প্রতি বিরোধিতার ধারণা নিয়ে রয়েছেন তাদের সম্পর্কে বলতে ইচ্ছা করে যে, ধ্বংসাত্মক ধারণার মাধ্যমে ভারতকে আর টুকরো করা যাবে না। সেই সঙ্গে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সূর্যকে যেমন কালো কাপড়ে ঢাকা যায় না, তেমনই সত্যও দিনের আলোর মতো চিরকাল স্পষ্ট ছিল, আছে ও থাকবে। □

আইনের শাসন

শাসকের আইনের অসহ্য উৎপাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনতার দু-হাত ঢেলে বিজেপিকে ভোট দেওয়া কেবল মাত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার করার জন্য।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে— অন্তত রাস্তায় এখনো কোনো আইনের শাসন নেই। যত্র-তত্র পার্কিং, অনির্দিষ্ট স্টপেজ, যেখানে সেখানে বাস দাঁড়ানো, অটোচালকের দাদাগিরি, যা খুশি ভাড়া দাবি, অনিয়ন্ত্রিত টোটো ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনকে এখনো দুর্বিসহ করে চলেছে।

একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি এবং জরিমানা ছাড়া পঞ্চাশ বছরের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি স্বস্তিকা পত্রিকার মাধ্যমে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

—**সুনীল চক্রবর্তী,**
কালিন্দী, কলকাতা-৪৮।

প্রশ্নফাঁসে দ্বিগুণ শাস্তির বিল পাশ লোকসভায়

বিরোধীরা ভোট না দিয়ে ওয়াক আউট করেছে কেন? নিজেকে ও সমাজকে প্রশ্ন করবেন?

তীব্র প্রতিবাদ ও অসম্মতি : বিরোধীরা ভোটারদের বোঝাতে চায় যে তারা এই বিলটির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনোভাবেই অংশীদার হতে রাজি নয়। প্রশ্ন : এরা এমন কী প্রস্তাব দিয়েছিল, যা সরকার মানেনি?

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভাবের অভিযোগ : বিরোধীরা বার্তা দেয় যে সরকার আলোচনা বা বিতর্কের কোনো সুযোগ দিচ্ছে না, নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জোরপূর্বক বিল পাশ করাচ্ছে এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছে।

প্রশ্ন : ২ দিন বরাদ্দ ছিল আলোচনার জন্য, এরা কেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করলো না?

জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ : সংসদ বর্জন করলে গণমাধ্যমে এটি খুব বড়ো খবর হিসেবে হেডলাইন হয়। এর মাধ্যমে বিরোধীরা সাধারণ ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যাতে বিলটির নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে জনমনে আলোচনা তৈরি হয়।

প্রশ্ন : জনগণকে কী করে সরকারি দল বোঝাবে যে, বিরোধীরা যখন ক্ষমতায় ছিল, তারা যদি এমন আইন করতো, তাহলে আজকে এই আইন করতে হতো না। মন্ত্রী এসে কি এক্সপার্ট ও বিরোধী দলকে নিয়ে দূরদর্শনে ডিবেট করবেন?

ভবিষ্যৎ নির্বাচনের রাজনৈতিক মাইলেজ : ভোটারদের কাছে নিজেদের 'জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি' হিসেবে তুলে ধরা এবং আগামী নির্বাচনে সরকারের এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা।

প্রশ্ন : যে বিরোধীরা পার্লামেন্টে গঠনমূলক আলোচনা না করে গণ্ডগোল করে, তারা কী করে 'জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি' হন?

দায়বদ্ধতা এড়ানো : ভবিষ্যতে যদি ওই বিল বা আইনের কারণে দেশে কোনো বড়ো সমস্যা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, তবে বিরোধীরা ভোটারদের বলতে পারে— 'আমরা এর অংশ ছিলাম না, আমরা এর প্রতিবাদে সংসদ বর্জন করেছিলাম।'

প্রশ্ন : বিরোধী দলের কাজ কি দায়বদ্ধতা এড়িয়ে গণ্ডগোল করা এবং শুধুমাত্র ভাতা নেওয়া?

আপনি কি রাজনীতি সচেতন? আপনার মনে কী কী প্রশ্ন এলো? কোন যুক্তিতে মনে করেন বিরোধী দল ওয়াক আউট করে ঠিক করেছে? যদি তাদের ভুল হয়ে থাকে আপনি কি আপনার দলকে ই-মেইল করে জবাব চাইবেন? না চাইলে আপনি গণতন্ত্রে বাস করার যোগ্য কিনা মনোবিদকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রতিবাদ করার সরকারি আইন কি আন্দোলনকারীরা মেনেছিল? মকবুল ফিদার যেমন নগ্ন সরস্বতী আঁকার অধিকার আছে, অথচ নবী বা তার স্ত্রীদের তিনি কোনো ছবি আঁকতে সাহস পায়নি, এমনই ভাবেই কি আন্দোলনকারীদের সব কিছু করার অধিকার থাকে? নিজেকে ও সমাজকে প্রশ্ন করবেন?

—**মৃণাল মজুমদার,**
বার্লিন, জার্মানি।

গোয়া-দমন-দিউয়ের ভারত ভুক্তিতে স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো। কিন্তু স্বাধীনতার সূর্য ওঠার পরও ভারতের পশ্চিম উপকূলে রয়ে গেল পরাধীনতার ছায়া। গোয়া, দমন ও দিউ তখনও ছিল পর্তুগিজ শাসনের অধীনে। স্বাধীন ভারতের মানচিত্র যেন অসম্পূর্ণ— একদিকে স্বাধীনতার উল্লাস, অন্যদিকে উপনিবেশিক শৃঙ্খলের অপমান।

পর্তুগাল সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল--- গোয়া তাদের 'বিদেশি উপনিবেশ' নয়, বরং পর্তুগালের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে আলোচনার পথ দীর্ঘদিন কার্যকর হয়নি। ভারত সরকার প্রথমদিকে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়নি। অবশেষে কয়েক বছরের আন্দোলন, জনচাপ ও সরকারি উদ্যোগ একসঙ্গে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'অপারেশন বিজয়'-এর মাধ্যমে গোয়া, দমন ও দিউ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরে সাংবিধানিক ভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এই দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাসে বিভিন্ন সংগঠন, স্থানীয় কর্মী, জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের আলোচনা পাওয়া যায়। সেই আলোচনায়

ফঃ ৩

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকের ভূমিকার কথাও বহু লেখায় ও স্মৃতিচারণে উল্লেখ করা হয়। বিশেষত ১৯৫০-এর দশকে গোয়া মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন সত্যাগ্রহ কর্মসূচিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে। কিছু বিবরণে সীমান্ত অঞ্চলে সংগঠন, জনমত তৈরি এবং আন্দোলনকারীদের সহায়তার কথাও উঠে আসে। তবে ইতিহাসবিদদের মধ্যেও বিষয়ে মতভেদ রয়েছে— অনেকে মনে করেন চূড়ান্ত মুক্তির নির্ধারক শক্তি ছিল ভারত সরকারের সামরিক ও কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত।

তবে একটি বিষয় অস্বীকার করা কঠিন— গোয়া মুক্তি কেবল সামরিক অভিযান ছিল না; এটি ছিল ভারতীয় জাতীয় সংহতির এক প্রতীকী অধ্যায়। যারা আন্দোলন করেছে, যারা রাস্তায় নেমেছে, যারা রাজনৈতিক চাপ তৈরি করেছে এবং যারা সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে— সবাই মিলেই এই অধ্যায়ের অংশ।

১৯ ডিসেম্বর ১৯৬১ সাল এই দিনটি শুধু একটি ভূখণ্ড মুক্তির দিন নয়; এটি ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এদিন প্রায় সাড়ে চারশো বছরের পর্তুগিজ শাসনের অবসান ঘটে এবং গোয়া, দমন ও দিউ নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। পরে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনের মাধ্যমে অঞ্চলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আজ যখন গোয়া, দমন ও দিউর ইতিহাসের দিকে তাকাই, তখন আমরা শুধু অতীত স্মরণ করি না— আমরা বুঝি যে জাতীয় ঐক্য, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, গণআন্দোলন এবং সরকারি সক্ষমতা একসঙ্গে ইতিহাস নির্মাণ করে। ইতিহাসকে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে তথ্যের শৃঙ্খলাও সমানভাবে জরুরি।

—**শুভাশীষ পাইন,**
পুয়াবাগান, বাঁকুড়া।

রাজনীতি ভীষণ গতিশীল

রাজনীতি গতিশীল। Politics Science আগে কলা বিভাগের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে এই বিষয়টি বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে রয়েছে। কারণ Politics static নয় Politics Dynamic অর্থাৎ রাজনীতি ভীষণ গতিশীল। Politics today আর Politics tomorrow এক নয়। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের বদ্যানতায় বাঙ্গালির প্রতিষ্ঠিত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় জনসঙ্ঘ এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গে এক ঘরে করে রাখা হয়েছিল। আর আজ? এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেসকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দিয়েছে। সমাজে ছুয়াছুতের বিরুদ্ধে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দীর্ঘদিন কাজ করে এসেছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সফল না হলেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সফল হয়েছে। তার প্রধান কারণ স্বয়ংসেবকরা তাদের ব্যবহার ও দৈনিক কার্যক্রমের মধ্যে কাউকে অস্পৃশ্য মনে করে না।

এবার ভেবে দেখুন কেন এবং কীসের জন্য এই শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট ভারতীয় জনসঙ্ঘকে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অচ্ছুত করে রেখেছিল? রাজনৈতিক দল তো সামাজিক সংগঠনও বটে। আসলে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা ভীষণ হিন্দু বিরোধী। ভারতীয় জনসঙ্ঘ দেশ বিভাগের পর সৃষ্টি হওয়ার কারণেই তাদের কাজ ছিল হিন্দুর অনৈক্য দূর করে, সমগ্র হিন্দু সমাজের কল্যাণ করা, তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করা। এতে তো কারও রাগ হওয়ার কথা নয়। কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা চায় হিন্দুদের দাবিয়ে রাখতে। তার জন্য তারা বিজেপিকে অচ্ছুত করে রেখেছিল? তার জন্য ওরা মুসলমানদের তোষণ করে ভোটব্যাংক তৈরি করেছিল। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট না করেছে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি, না করেছে ওদের দেশপ্রেমিক। তাই বলে মুসলমান সমাজে কেউ দেশভক্ত মানুষ নেই একথা বলছি না। বলছি কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা একাজে সচেষ্ট হয়নি।

মমতা ব্যানার্জি তো ওদের অপরাধী বানিয়েছে। ওদের উসকানি দিয়ে বাস, ট্রেন জ্বালিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মানুষকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সবাই এসব জানে।

দেশভক্ত মানুষেরা সামগ্রিক চেষ্টায় ২০২৬ সালে ঘটেছে এক বিশাল হিন্দু জাগরণ। তার প্রভাব পড়েছে ব্যালট বাক্সে। পতন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী শাসনের। রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। এসব কি সহ্য হয় ওদের? তাই নতুন ন্যারেটিভ 'প্রশ্ন ফাঁস'। নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের পর সরকার দ্রুততায় পরীক্ষা বাতিল, তদন্ত শুরু ও ধরপাকড় করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে বছর নষ্ট না হয় তার জন্য আবার পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশ করেছে। সফল পরীক্ষার্থীদের সারা দেশে খুশি দেখা দিলেও খুশি হয়নি আরশোলারা। তারাই প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট- অখিলেশ-মমতা সবাই আরশোলার পেছনে এসে দাঁড়ায়। দিল্লি ও কয়েকটি রাজ্যে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করে। সেখানে দেশ বিরোধী স্লোগান, হিন্দু বিরোধী স্লোগান কেন?

সেখানে আজাদি আজাদি আওয়াজ তুললো কারা? কারা বললো দেশকে টুকরো টুকরো করে দেব?

রাহুল-প্রিয়াংকা-অখিলেশ-মমতা সবাই পেছন থেকে মদত দিয়ে হিংসা ছড়াতে শুরু করেন। পুলিশ ও সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ হয়। সরকার বুঝতে পারে আন্দোলন আর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নেই। এই সব কুচক্রী রাজনৈতিক মহল ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁধে বন্দুক রেখে লড়াই করতে চাইছে। তাই নরেন্দ্র মোদী সরকার দ্রুততায় ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করিয়ে আন্দোলনের ইতি ঘটায়। যে নোংরা ন্যারেটিভ ওরা তৈরি করে দেশকে রক্তাক্ত করতে চেয়েছিল এবার সেই ন্যারেটিভকে অকেজো করে সুষ্ঠ ন্যারেটিভ তৈরি ও চক্রান্তকারীদের কঠোর হাতে শাসন করতে হবে। দেশে সুষ্ঠ রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষা অনেকটাই নিশ্চিত

মৌ চৌধুরী

অনেকদিন পর বেআইনি দখলমুক্ত পার্কসার্কাস স্টেশনে নেমে বেশ ভালো লাগছিল। সকালের দিকটাতে এলে মায়া, গৌরী, কল্পনা, কমলা, নীলিমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবেই। ওরা প্রায় জনাত্রিশেক বিভিন্ন বয়েসি মেয়ে ক্যানিঙের দিকের ট্রেন থেকে এই স্টেশনে নামে। ওরা সবাই বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মী। আমি ওদের সবাইকে চিনি। একটি এনজিও'র উদ্যোগে আয়োজিত 'মহিলাদের সচেতনা বৃদ্ধি' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলাম তখনই ওদের সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমার ওদের দেখে ভালো লাগছিল। আগে যতবার দেখেছি সকলের চোখে মুখে ভয় আর মলিনতার ছাপ লক্ষ্য করেছিলাম। এখন নেই। কারণটা জানতে চাইলে একটি ছোটো জুতো তৈরির কারখানার কর্মী মায়া জানালো আগে একটা ভয় ছিল। আমাদের অনেকেরই কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে রাত হতো। আমার দাদা বা বাবা স্টেশনে থাকতেন। কিন্তু সকলের তো তা নয়। বাড়ি ফেরার পথে শকুন-হায়নারা ওঁত পেতে থাকে। তারা জোর করে নিয়ে যেত। না গেলে আমাদের বা ভাই বাবাকে মারত, জরিমানা, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, এমনকী হত্যাও করেছে।

সন্দেশখালির থেকেও ভয়ানক ছিল ক্যানিং, কাকদ্বীপ, জয়নগর, ফলতা এলাকা। ট্রেনের শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা কতটা ভয়াবহ ছিল কল্পনার বাইরে। তারপর আছে পাচার। মায়া বলছিল,'হায়না শকুনরা বলত, তাদের দিদি বলে দিয়েছে রাত আটটার পরে বাইরে মেয়েরা থাকলে যে কেউ যা খুশি করতে পারে। হতে পারে আমরা এটাকে ভাগ্য বলেই ধরে নিয়েছিলাম। একেক সময় মনে হতো না জন্মালেই ভালো ছিল আর জন্ম হলোই যদি কেন যে হিন্দু হয়ে জন্মেছিলাম।'

ওরা সকলেই অতি দরিদ্র পরিবারের। তাই বাধ্য হয়েই জীবিকার জন্য ঘরের বাইরে আসতে হয়েছে। গৌরী একটি সংস্থার হয়ে বেসরকারি হাসপাতালের সাফাই কর্মী হিসেবে দিনে তিনশো টাকার রোজে কাজ করে। দুই সন্তানের মা গৌরী জানালো তাকেও হেনস্থা হতে হয়েছে। ওর ভাষায়, 'আমরা বড়োই অসহায় ছিলাম। কেউ পাশে ছিল না। স্বামী বলত মানিয়ে নে। নইলে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবে।'

ওরা অনেকেই এলাকার তৃণমূল নেতাদের মাসিক একশো থেকে দুশো টাকা তোলার বিনিময়ে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা পেত। এখন প্রায় সবাই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পায়। তার জন্য কোনো তোলা দিতে হয় না। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও ছিল। কিন্তু কলকাতার কোনো হাসপাতালে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া চলত না। এখন তারা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে ওদের কথায় এখন সমস্যা অনেক কমেছে। মেয়েরা কাজ সেরে রাত করে ফিরতে পারছে। তবে হায়না শকুনরা আছে। পুলিশ তাদের কিছু করছে না। এখানেই কিছুটা আশঙ্কা থাকছে।

কথা প্রসঙ্গে ওরা জানালো, বিভিন্ন স্টেশনে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদে ওরা খুশি। বিশেষ করে পার্কসার্কাস স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মের বেশ কয়েকটি দোকানের সামনে ভিড় করে থাকত ছিনতাইবাজরা। তাছাড়া কোনো মেয়ে কোন ট্রেনে আসে বা যায়, এমনকী কত নম্বর কামরায় ওঠে সেইসব খবর দিয়ে দিত হায়না শকুনদের। মায়াদের কথায় বিধানসভা ভোটের আগে থেকেই ওদের ওপর চাপ ছিল। তাই নিজেদের রক্ষা করতেই বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।

বারুইপুর কলেজের স্নাতক ও একটি শপিং মলের হিসেবরক্ষক কমলার কথায়, 'বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসাতে আমরা ধনী হয়ে যাব, রাজ্য অপরাধশূন্য হবে— এমনটা কখনোই ভাবি না। আমাদের আর্থিক উন্নতি একই থাকবে, কিন্তু মহিলাদের সুরক্ষা কিন্তু অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছে। এই সুরক্ষার বিষয়টি আমাদের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা প্রান্তিক জায়গায় থাকি, জীবন ও জীবিকার কঠিন সংগ্রামের কথা শহরের ড্রইং রুমে যায় না। আর মহিলা সুরক্ষা তো তাদের কাছে হাস্যকর। কিন্তু সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। সবথেকে কঠিন ও প্রাথমিক বিষয়টি সরকার আমাদের দিয়েছে।' ইস্পাত কঠিন মুখ নিয়ে কল্পনা বলল, 'এবার হায়না শকুনরা আসুক, ওদের বুক ছিঁড়ে দেখাব দুর্গাশক্তি কাকে বলে। আমি ওর হাতে হাত রেখে নির্বাক নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইলাম। □

অবসাদ অনুভব করা, বুক ধড়ফড় করা, রাতে ঘন ঘন প্রস্রাব; নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব, পায়ের গোড়ালিতে জল জমা ও রক্তচাপ কমে আসা এর উপসর্গ।

গর্ভাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশির সমস্যায় সচেতনতা জরুরি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

হৃদ্‌রোগ বলতে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালি-সহ অন্তঃপ্রাচীরের পর্দার ভিতরে চর্বি জমা (cholesterol deposition under intima) বা রক্তনালি-সহ মাংসকোষের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে (smooth muscle cell proliferaion) রক্তনালির অন্তঃপ্রকোষ্ঠের (lumen) নালার সরু হওয়ার ফলে মাংসপেশিতে (myocardium) প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও রক্ত সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে বা হৃদ্‌যন্ত্রের প্রদাহ তৈরি করে।

তবে মাতৃত্বকালীন বা গর্ভাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের রক্তনালির অন্তর দেওয়ালে ফাটল (spontaneous coronary artery dissection), রক্তনালির অস্বাভাবিক ফুলে যাওয়া (takotsubo disease), হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশির দেওয়াল ফুলে বড়ো হয়ে দুর্বল হওয়া (peripartum cardiomyopthy) উল্লেখযোগ্য। এই তিন রোগকেই ব্রোকেন হার্ট সিনড্রোম (Broken Heart Syndrome) বলা হয়।

Spontaneous Coronary artery dissection -এর ফলে গর্ভবতী মা বুকে অস্বাভাবিক প্রদাহ এবং সঙ্গে শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকেন। উপসর্গ অনেকটা হার্ট অ্যাটাকের মতোই। রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করেন। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে ১%-৪% ও শুধু ৫০-এর নীচের মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৩৫% হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়ে থাকে এবং ৪৩% গর্ভবতী মা এই সমস্যায় ভুগে থাকেন।

গর্ভকালীন দুশ্চিন্তা, শারীরিক ও মানসিক চাপ রক্তনালিতে ব্যবচ্ছেদ (dissection) করে। এতে করে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশিতে প্রদাহ তৈরি করে। তিনটি মূল রক্তনালির যেকোনোটাই আক্রান্ত হতে পারে। বিশেষ করে LAD বাঁদিকের মূল রক্তনালি 32-46%, LAD, Diagonal Septal 45-61%, LCX, Ramus, OM 10-39%, LM বা বাঁয়ের মূল রক্তনালির মুখের অংশ আক্রান্ত হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সবগুলোই আক্রান্ত হতে পারে।

রোগী ভর্তি হয়ে যে প্রতিষ্ঠানে করোনারি এনজিওগ্রাম সুবিধা আছে তাতে আক্রান্ত রক্তনালিতে Stent বা রিং বসিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। যেখানে সুবিধা নেই সেখানে প্রতিরোধমূলক (prophylactic) চিকিৎসা দেওয়া উত্তম। কেননা তাতে করে অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তক্ষরণ বা মাতৃগর্ভস্থিত শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব হতে মা ও শিশুকে রক্ষা করা যেতে পারে।

গর্ভকালীন সময় হার্টের মাংসপেশির ফুলে যাওয়ার ফলে প্রকোষ্ঠ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়া (cardiomyopathy) যা সাধারণত সন্তান প্রসবের এক মাস আগে ও পরের ছয় মাসে হয়ে থাকে।

এর ফলে হার্ট নির্দিষ্ট পরিমাপে রক্ত পাম্প করতে না পারার ফলে হার্ট ফেইলিওর হতে পারে, এতে করে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কম সরবরাহের ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশির প্রদাহ তথা ফুসফুসে ও পায়ে জল জমা ও শ্বাসকষ্ট এবং অল্পে হাঁপিয়ে উঠতে পারেন। অবসাদ অনুভব করা, বুক ধড়ফড় করা, রাতে ঘন ঘন প্রস্রাব; নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব, পায়ের গোড়ালিতে জল জমা ও রক্তচাপ কমে আসা এর উপসর্গ।

তবে অধিকাংশ রোগী ৫০-৬০ শতাংশ প্রথমেই রোগের নির্ণয় ও যথাবিহিত ডাক্তারের পরামর্শে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। কিছু ওষুধ, সহজে হজম হয় এমন খাবার, ০.৮-১.০ লিটার বা ৪ গ্লাস জল কিংবা তরল পানীয়, সহনীয় মাত্রায় হাঁটা চলাফেরা করা এবং নিয়মিত চেকআপ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। ঋতুস্রাব বন্ধের ঠিক আগে বা পরে Takotsubo heart disease যা কিনা হার্টের মাংসপেশিতে ক্ষত তৈরি করে বেলুনের মতো ফুলে ওঠে মানসিক চাপ ও হরমোনের তারতম্যের কারণে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসু।

রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে কলকাতা রথীন্দ্র মঞ্চে বিশেষ আলোচনাসভা

কলকাতা বড়বাজারের রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৫ জুলাই জোড়াসাঁকোস্থিত রথীন্দ্র মঞ্চে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলনের অমর হুতাত্মা রামকুমার কোঠারীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'সশক্ত হিন্দু—সমর্থ পশ্চিমবঙ্গ' শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা সমাজসেবী অংশুল চামেরিয়া। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তথা সামাজিক কার্যকর্তা পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ। এছাড়াও মঞ্চাসীন ছিলেন কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগিনী পূর্ণিমা কোঠারী এবং স্মৃতি সঙ্ঘের সংরক্ষক রাজেশ আগরওয়ালা। সভার শুরুতে উপস্থিত অতিথিবর্গ প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভারতমাতা ও অমর হুতাত্মা কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তারপরেই রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের সারা বছরের কার্যক্রমের উল্লেখ করে সংস্থার বিস্তারিত পরিচয় দান করেন স্মৃতি সঙ্ঘের সদস্য রজত চতুর্বেদী। সভাপতির ভাষণে অজয় নন্দী বলেন, আজ আমরা এই আলোচনা সভার আয়োজন এজন্য করেছি যে, বহু করসেবক শ্রীরামমন্দিরের জন্য প্রাণ বলিদান করেছেন, কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান প্রজন্মের তাঁদের সম্পর্কে অবহিত থাকা উচিত। প্রধান বক্তার ভাষণে পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ দাবি করেন, ব্রিটিশের কুখ্যাত জালিওয়ালানবাগ হত্যাকাণ্ডে নিহতদের নাম যেমন সেখানকার উদ্যানে প্রস্তরফলকে খোদাই করে রাখা আছে, তেমনই অযোধ্যায় নবনির্মিত শ্রীরাম মন্দিরের প্রবেশদ্বারের পাশে হুতাত্মা সমস্ত করসেবকের নাম প্রস্তরফলকে খোদাই করে রাখতে হবে। তাহলেই হুতাত্মা করসেবকদের প্রতি কিছুটা হলেও সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং আগামী প্রজন্ম এদের আত্মত্যাগের কথা মনে রাখবে। আলোচনাসভায় রথীন্দ্র মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় শ্রোতৃমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ ছিল। সভা সঞ্চালনা করেন স্মৃতি সঙ্ঘের সদস্য সঞ্জয় মণ্ডল।

সংস্কার ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নটরাজপূজন

গত ২৬ জুলাই সংস্কার ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরের 'ঋদ্ধি সিদ্ধি' ভবনে শ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নটরাজপূজনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক নীলাঞ্জন পাল, সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, প্রান্ত সহ-সভাপতি অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, জেলা সভাপতি নৃত্যসাধিকা মোনালিসা ঘোষ এবং সহ-সভাপতি মনোরঞ্জন মণ্ডল। উপস্থিত অতিথিগণ নটরাজমূর্তির সম্মুখে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। ভাবসঙ্গীত পরিবেশনের পর জার্মানি থেকে আগত জার্মান মেটা থিয়েটারের ছ'জন নাট্যব্যক্তিত্বকে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপরেই শিল্পীসম্মান প্রদান করা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট তবলাবাদক তন্ময় দাস মহাশয়কে। শ্রীমতী রায় গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীপাল ব্যক্তিজীবনে গুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। জার্মান মেটা থিয়েটারের কর্ণধার অ্যাক্সেল ট্যাঙ্গাডিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরেছেন বলে আনন্দ প্রকাশ করেন। সাংস্কৃতিক পর্বে নিত্যানন্দ মুখার্জির পরিচালনায় 'শিববন্দনা' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণ' কবিতা অবলম্বনে শ্রুতিনাটক 'সত্যকাম' সহযোগে পুতুল নাটক পরিবেশিত হয়। নাট্যরূপ দিয়েছেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং পুতুল নাটক পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্য ডঃ প্রদীপ সরদার ও তাঁর 'বারুইপুর গঙ্গারিডি পাপেট থিয়েটার'-এর সদস্যরা। পাপিয়া ভট্টাচার্যের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় তিনটি সরগম-সহ সমবেত সঙ্গীত। এরপর পরিবেশিত হয় ওড়িশি নৃত্যগুরু মোনালিসা ঘোষ মহাশয়ার দশাবতার ও নির্বাণাষ্টকমের ওপর এক অসাধারণ নৃত্যানুষ্ঠান। তপতী দাস ব্রহ্মের একক আবৃত্তি এবং তমাল দাসের একটি সুন্দর ভজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লিপিকা চৌধুরী এবং ধন্যবাদ জানান জেলা সম্পাদক রাজকুমার গুঁই। ভরত কুণ্ডুর সুললিত কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত ' বন্দে মাতরম্'-এর পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

একাধিক সম্মানে ভূষিত সঞ্জীব কুমার সরকার

সংস্কার ভারতী মালদহ জেলা মঞ্চীয় কলা সংযোজক সঞ্জীব কুমার সরকার ইদানীং বেশ কিছু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ২০২৫ সালে ৩১ আগস্ট ফারাক্কায় আয়োজিত সর্বভারতীয় সঙ্গীত সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে 'গুরুশ্রী সম্মান'; ২০২৫ সালে কলকাতা মহাজাতি সদনে সর্বোত্তম পরীক্ষক হিসেবে 'সংস্কৃতি সৈনিক সম্মান'; ২০২৬ সালে ৫ জুলাই কলকাতার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চে আবৃত্তিকার হিসেবে ' বঙ্গ শিরোপা সম্মান'; ২০২৬ সালে ৮ জুলাই প্রয়াগরাজে ভারত সরকারের নীতি আয়োগ অনুমোদিত ফেসবুক হেল্পিং হিউম্যানস্ দ্বারা 'ভারত রত্ন' জাতীয় সম্মান। সেই উপলক্ষ্যে গত ২৪ জুলাই গাজোল শান্তি লজে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে স্বস্তিকা পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে পরেশ চন্দ্র সরকার আমন্ত্রিত ছিলেন। সেখানে সঞ্জীববাবু তাঁর প্রাপ্ত সম্মানগুলির উল্লেখ করেন।

বাঁকুড়া জেলা সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে সংস্কৃত সম্মেলন

ভারতীয় জ্ঞানচর্চা, দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতির এক অনন্ত ভাণ্ডার সংস্কৃতভাষার ঐশ্বর্যকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সমাজে সংস্কৃতভাষার নবজাগরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে গত ২৬ জুলাই বাঁকুড়া জেলা সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংস্কৃতানুরাগী শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং সংস্কৃতপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। বেদমন্ত্রোচ্চারণ, সরস্বতী বন্দনা ও ধ্যেয়মন্ত্রে উপস্থিত সকলে ভারতীয় ঋষি-ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন বাঁকুড়া জেলা আরক্ষাধীক্ষক ভি জি সতীশ পসুমার্থী, বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসক প্রলয় মণ্ডল, সংস্কৃত পণ্ডিত তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃতভারতীর ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী প্রণব কুমার নন্দ, প্রান্ত অধ্যক্ষ ডঃ তন্ময় ভাট্টাচার্য, বিধায়ক চন্দনা বাউড়ী, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং পূর্বতন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার।

স্বাগত ভাষণে জেলা সংযোজক কৃষ্ণেন্দু মহাপাত্র সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সংস্কৃত ভাষার সর্বজনীন গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর সুভাষিত পাঠ, কিশোরী প্রীতি রায়ের মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন, উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্য এবং বিষ্ণুপুরের মড়ার সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। বক্তারা তাঁদের ভাষণে সংস্কৃতকে কেবল একটি প্রাচীন ভাষা হিসেবে নয়, ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে অভিহিত করেন। একই সঙ্গে তাঁরা আধুনিক শিক্ষার পরিসরেও সংস্কৃতভাষার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে এর চর্চা বিস্তারের আহ্বান জানান।

সমাপ্তি পর্বে বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কবিতা তা-র বৈদিক গীত ও শান্তিমন্ত্রে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান এক ভাবগম্ভীর ও আধ্যাত্মিক আবহে পরিসমাপ্তি হয়।

গাজোল সরস্বতী শিশুমন্দিরে ক্ষত্রিয় সম্মেলন

গত ২৬ জুলাই বিকেলে গাজোল মনোমোহন শ্রীমতী দেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশাল ক্ষত্রিয় সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ ভবানীচরণ সিংহ, সহ সম্পাদক দীপঙ্কর কমল বর্ম্মা, সদস্য তপন সরকার, মালদহ জেলা

সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলার মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ ফণীভূষণ রায়, সম্পাদক ভূপেশচন্দ্র বর্মন, সহ-সম্পাদক সৌমিক বর্মন প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং ক্ষত্রিয় সমিতির পতাকা উত্তোলনের পর সমিতির ভাবসঙ্গীত পরিবেশন করেন পরেশ চন্দ্র সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভূপেশচন্দ্র বর্মন। ভাষণ দেন ডাঃ ফণীভূষণ রায়, ভবানীচরণ সিংহ গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মন ও দীপঙ্কর কমল বর্ম্মা। উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পরেশ চন্দ্র সরকার। এরপর গাজোল ব্লক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি– গোবর্ধন মণ্ডল। সহসভাপতি– নগেন্দ্রনাথ সরকার। সম্পাদক– কৃষ্ণ বর্মন। সহ সম্পাদক– ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার। কোষাধ্যক্ষ– অশোক সরকার। সদস্য– গোবিন্দ চন্দ্র সরকার, অনিমেষ সরকার, তপেশ চন্দ্র বর্মন, জয়জিৎ সরকার, বিপুল চন্দ্র সরকার ও নীহার মণ্ডল। উপদেষ্টা– সুরেন্দ্রনাথ সরকার। সম্মেলন পরিচালনা করেন সৌমিক বর্মন।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে রক্তার্পণ শিবির

গত ২৬ জুলাই খড়দহ রুইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে রক্তার্পণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত বহুজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাদের হাতে একটি করে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের প্রাণপুরুষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী, প্রাবন্ধিক, খড়দহের বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের অধ্যক্ষ ডঃ সুশান্ত মজুমদার-সহ সংগঠনের কার্যকর্তা— পরিতোষ বিশ্বাস, পরেশ মুখার্জী, জগবন্ধু দাস, সমীর গোস্বামী। রক্তদাতাদের হাতে একটি করে ছাতা দেওয়া হয়। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন টালিগঞ্জ রামকৃষ্ণ যোগাশ্রমের শ্রীমৎ চৈতন্য মহারাজ।

ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের যৌথ উদ্যোগে গুরুপূর্ণিমা উৎসব উদ্‌যাপন

শ্রীগুরুপূর্ণিমা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রাচীন ও পবিত্র পর্ব। গুরু-শিষ্যের মহান সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন অতি প্রাচীনকাল থেকেই। মালদা ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের যৌথ উদ্যোগে গত

২৯ জুলাই শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসবের আয়োজন করা হয় মালদা শহরের ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক অমর চন্দ্র কর্মকার এবং ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বতন শিক্ষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য প্রবীর কুমার মিত্র। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিদের করকমলে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। তারপর শিক্ষিকা মাম্পি দত্তের পরিচালনায় ছাত্রদের দ্বারা বন্দে মাতরম্ পরিবেশিত হয়। শ্রীকর্মকার ছাত্রদের সামনে শ্রীগুরুপূর্ণিমার গুরুত্ব এবং ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন।

শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা, চরিত্রগঠন, শৃঙ্খলা এবং জাতীয় চেতনার গুরুত্ব বিষয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন প্রগতিকান্তি বিশ্বাস, স্বগতা গুহ নিয়োগী, রণজিৎ ব্যানার্জী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ছাত্রদের দ্বারা মা-বাবাকে গুরুর আসনে বসিয়ে পিতৃ-মাতৃপূজন। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। এরকম অনুষ্ঠান প্রতি বছর যাতে করা হয়, তার জন্য তাঁরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন রাখেন।

দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

গত ১৯ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরে স্বস্তিকা পত্রিকার স্থানীয় প্রচার প্রতিনিধি ধ্রুব বসুর উদ্যোগে স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার প্রকাশক সারদাপ্রসাদ পাল, স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল এবং স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সঙ্ঘের ঠাকুরপুকুর ভাগ সঙ্ঘচালক মনোরঞ্জন হাতি। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। স্বাগত ভাষণ দেন ধ্রুব বসু। স্বস্তিকার প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল পত্রিকার প্রচার-প্রসার এবং বিতরণের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। এরপর পাঠকগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। স্থানীয় পাঠক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একক গীতের পর স্বস্তিকা পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ রাখেন সারদাপ্রসাদ পাল। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন স্বস্তিকার লেখিকা শ্রীমতী অরুণা রায়চৌধুরী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বস্তিকার স্থানীয় পাঠক সৌম্য মণ্ডল। শান্তিমন্ত্র পাঠের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএমএস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৩ জুলাই ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ'-এর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিএমএস-এর পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিক্ষাকর্মীরা একত্রে পতাকা উত্তোলন করেন এবং বিএমএস-এর শ্রমিক গীত পরিবেশিত হয়। এরপর বিএমএস-এর প্রতিষ্ঠা, এই সংগঠনের ঐতিহ্য, রাষ্ট্রবাদী শ্রমিক সংগঠন বিএমএস-এর প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে পদ্মভূষণ দত্তোপন্ত বাপুরাও ঠেংড়ীজীর অবদান, সংগঠন পরিচালনার প্রেক্ষিতে ঠেংড়ীজীর নির্দেশ ও দর্শন এবং রাষ্ট্রনির্মাণে বিএমএস শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকার বিষয়ে এদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘের প্রদেশ কমিটির কার্যকরী সভাপতি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী অসীম মিত্র, সংগঠনের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেব, সহ-সম্পাদক আশিস চক্রবর্তী, ইউনিট সদস্য শম্ভুরাম নস্কর, সদস্য বাসুদেব হাঁসদা ও সংগঠনের অন্যান্য কার্যকর্তা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এদিনের এই অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ সম্পর্কে এক ব্যাপক জনজাগরণ সৃষ্টি করে।

ফ : ৪

SURYA
Shaping Structures That Shape Tomorrow
Steel is what turns plans into lasting structures. Surya provides high-quality steel solutions that support construction, infrastructure, and development. Engineered for strength and consistency, they help projects move forward with confidence.
Because the future is built on what holds firm today.
PRAKASH
SURYA
SURYA HAI TOH BHAROSA HAI
Lighting | Wires and Cables | Professional Lighting | Fans | Appliances | Water Pumps | PVC and Water Tanks | Steel Pipes
I am SURYA
50 YEARS OF TRUST
DURABLE PRODUCTS
ASSURED QUALITY
SURYA ROSHNI LIMITED | consumercare@surya.in | www.surya.co.in
TOLL FREE
1800 102 5657

কলকাতা বিমানবন্দরে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৩ জুলাই কলকাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভারতের বৃহত্তম কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস)-এর ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। রাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী ১৯৫৫ সালের ২৩ জুলাই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মবার্ষিকীতে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদিন বিএমএস-অনুমোদিত সংগঠন 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর উদ্যোগে বিমানবন্দরের ভলভো বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত হয় বিএমএস-এর ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক শুভম দে-সহ ইউনিয়নের কার্যকর্তা দিলীপ বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ গায়েন, কোষাধ্যক্ষ দীপাঞ্জন হালদার ও বিএমএস-এর পূর্বতন রাজ্য সভাপতি তরুণকান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এয়ারপোর্টস্ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র আধিকারিক রাজকুমার প্রসাদ। দিলীপ বিশ্বাসের কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ভারতের জাতীয় পতাকা ও বিএমএস-এর পতাকা উত্তোলনের পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি ও সংগঠনের কার্যকর্তারা ভারতমাতা ও পদ্মভূষণ দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। শ্রমিক গীত--- 'জনসেবা যে কর্ম আমাদের, ধর্ম আমাদের মানবতা' পরিবেশন করেন শুভম দে। বিএমএস-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যক্রমের বিষয়ে শ্রমিকদের উদ্দেশে এদিন বক্তব্য রাখেন তরুণকান্তি ঘোষ। রাষ্ট্রহিত, উদ্যোগ-হিত ও মজদুর-হিতের যে মহান আদর্শকে পাথেয় করে সারা দেশব্যাপী রাষ্ট্রবাদী শ্রমিক সংগঠন বিএমএস ও বিএমএস-অনুমোদিত সংগঠনগুলির শ্রমিক ও কর্মচারীরা একাগ্রচিত্তে রাষ্ট্রনির্মাণের কাজ করে চলেছেন সেই বিষয়টি তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। শ্রমিক স্বার্থে বক্তব্য রাখেন— শুভম দে, দিলীপ বিশ্বাস ও রাজকুমার প্রসাদ। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্বজিৎ গায়েন। তাঁর কণ্ঠে শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ'-এর আহ্বানে পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা

গত ২৮ জুলাই 'শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ'-এর আহ্বানে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত 'ধর্মতলা চলো'-শীর্ষক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দেশজুড়ে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে দেশকে অশান্ত করার প্রয়াস এবং দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রবিরোধীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার লক্ষ্যে এদিনের পদযাত্রার ডাক দেয় জাতীয়তাবাদী ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন 'শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ'। সম্প্রতি নিট (ইউজি) প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির চক্রান্ত রুখতে এবং কলকাতায় সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে— বিদেশি ডিপস্টেট-পুষ্ট সিজেপি ও রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে এদিন জাতীয় পতাকা হাতে 'রাষ্ট্র বাঁচাও পদযাত্রা'য় অংশগ্রহণ করেন অসংখ্য জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী। পদযাত্রা শেষে ধর্মতলায় রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সঞ্জীব নাগ, দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেসের অধ্যাপক ডঃ মনোরঞ্জন রায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সচিবালয়ের সদস্য ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক ড. সুশান্ত মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্টজন। গ্লোবাল ডিপস্টেটের মদতে— ককরোচ জনতা পার্টির দ্বারা সংগঠিত নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন ও তার সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি ইন্ডিজোটের অন্তর্গত রাজনৈতিক দলগুলির যৌথ কার্যকলাপের দ্বারা দেশজুড়ে যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টির অপপ্রয়াস চলছে তার বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া ও সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE
8/1/B, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700 027, India
www.paharpur.com
CIN : U02005WB1949PLC018363
Ph. +91-33-4013 3000
Dir. +91-33-4013 3403
Fax : +91-33-4013 3499
vswarup@paharpur.com

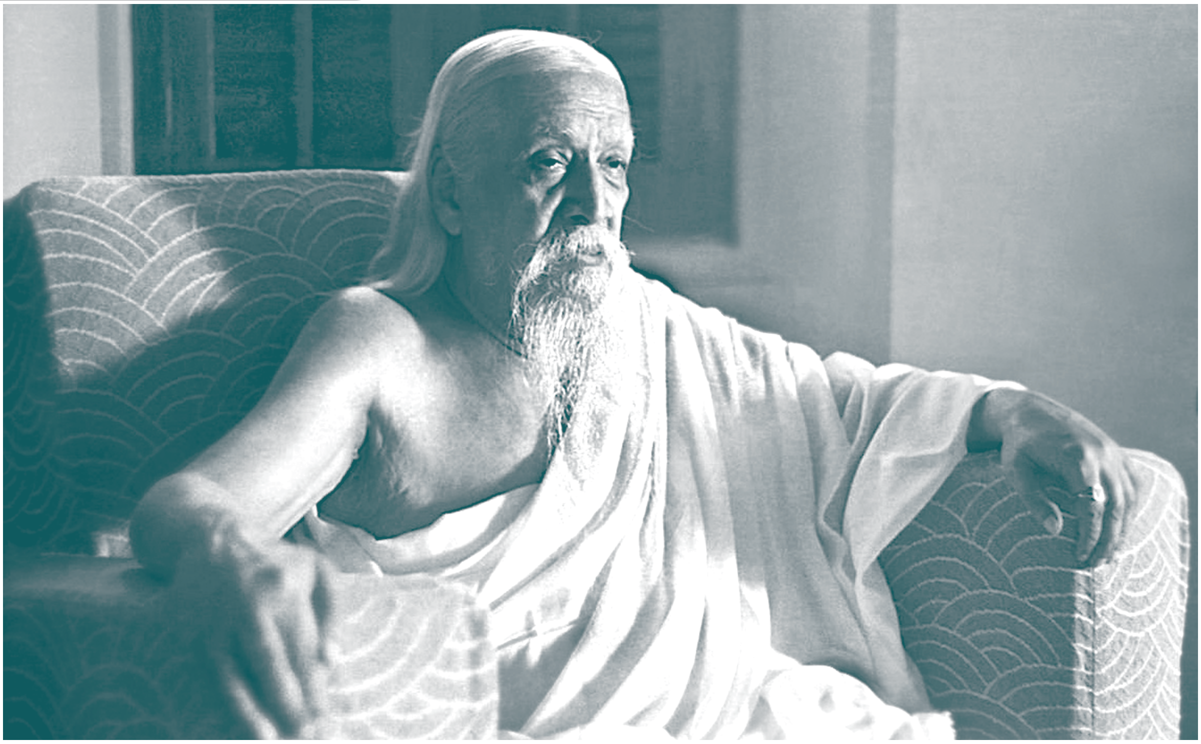

বিপ্লবী ও সন্ন্যাসী শ্রীঅরবিন্দ

বাপ্পাদিত্য মাইতি

কবি মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের 'সোমের প্রতি তারা' কবিতায় দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন শিষ্য সোমদেবের প্রতি। নিজের এই আচরণে কুণ্ঠিত তারার আত্মজিজ্ঞাসা ছিল— 'কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে কাকশিশু?' শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে পড়তে গেলে পাঠক মনেও এ প্রশ্নই উচ্চারিত হবে। কারণ হলো অরবিন্দের পরিবার ও ঘটনাপ্রবাহ। ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট অরবিন্দের আবির্ভাব। তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ সে যুগের কালাপানি প্রথাকে তুড়ি মেরে ইংল্যান্ডে পড়তে যান। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ইতিপূর্বেই তিনি ডাক্তারি পাশ করেছেন। কৃষ্ণধন ছিলেন উগ্র সাহেব। ইংল্যান্ডে পাঠ শেষ করে তিনি এদেশে এসে সনাতন কৃষ্ণনামকে সাহেবি নামে রূপান্তরিত করে ডাঃ কে.ডি. ঘোষে পরিণত হলেন। তাঁর স্ত্রী স্বর্ণলতা ছিলেন সুপণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। স্বামী যতটা সাহেবি, স্ত্রী ততোধিক ভারতীয়। ফলে ব্যক্তিজীবনে স্বর্ণলতা ছিলেন চরম অসুখী। পরে মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগেও তিনি আক্রান্ত হন। অরবিন্দ কিছুদিন দার্জিলিঙের লোরেটো স্কুলে পড়েন, তারপর ইংল্যান্ডে গেলেন। বাবা চান ছেলে পুরোদস্তুর সাহেব হোক।

ম্যাঞ্চেস্টারে যখন অরবিন্দ স্কুলে পড়ছেন, তখন পুত্রের শিক্ষকদের প্রতি ডাঃ কে.ডি. ঘোষের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল ছেলে যেন কোনো ভারতীয়র সঙ্গে না মেশে! অসম্ভব মেধাবী অরবিন্দ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ছিলেন তুখোড়। সেন্ট পলস্ স্কুল থেকে পাশ করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রবেশ। সেই সঙ্গে বার্ষিক আশি পাউন্ডের বৃত্তি লাভও। অরবিন্দের অন্য ভাইয়েরাও পড়তেন ইংল্যান্ডে। বাবা তেড়েফুঁড়ে নেমেছিলেন পরিবারকে বাদামি চামড়ার সাহেব বানাতে। ফলে ছাত্রাবস্থায় খুব একটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেতেন না। ছাত্র অরবিন্দ দোকানে ধারে জিনিস কিনে পয়সা দিতে না পারায় দোকানদার মামলা করার ভয় দেখালে প্রিয় অধ্যাপক প্রথেরো চিঠি লিখলেন ডাঃ কে.ডি. ঘোষকে, পুত্রকে কিছু টাকা পাঠাতে। বাবা টাকা পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল অমিতব্যয়ী বলে প্রত্যাঘাত। অরবিন্দ স্মিত হেসে বলেছিলেন প্রচুর খরচের টাকা তাঁর কাছে নেই— 'There was no money to be extravagant about'। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 'ইন্ডিয়ান মজলিস'-এর সভায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে গরম ভাষণ দিতেন। সে সময়ের সবচেয়ে দামি চাকরি আইসিএস পাশ করেও ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা ইচ্ছে করে না দিয়ে ব্রিটিশ প্রভুর সেবা করতে চাইলেন না অরবিন্দ।

দেশে ফিরে বরোদায় মহারাজ গায়কোয়াড়ের রাজ কাজে নিযুক্ত হলেন। গায়কোয়াড় অল্পদিনেই বুঝেছিলেন এই তরুণ লাজুক অতি মেধাবী। তরুণের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখাটা যোগ্য কাজ নয়। তিনি বরোদা কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন অরবিন্দকে। মাইনে সাতশো পঞ্চাশ টাকা। সে সময়ের হিসেবে অবিশ্বাস্য মাইনে। বিলেতে থাকার সময় তিনি সেভাবে বাংলা শিখতে পারেননি। বরোদায় শিখলেন বাংলা। অরবিন্দের মামা গোয়েন্দা গল্পের বিখ্যাত

লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে বরোদা পাঠালেন বাংলা শেখাতে। ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য তাঁর মায়ের বংশসূত্রেই তিনি অন্তরে অনুভব করেন। যতই পিতা ডাঃ কে.ডি. ঘোষ তাঁকে সাহেব বানাতে চান না কেন, তিনি হয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দ। সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করে গীতা, উপনিষদ আত্মস্থ করলেন। নিজেকে প্রস্তুত করলেন ধর্মযুদ্ধে অংশ নিতে। সে যুদ্ধ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, যার প্রবলতম সমর্থক ছিলেন তাঁরই পিতা! এ জন্যই মধুসূদনের কবিতাংশ আমরা শুরুতেই ব্যবহার করেছি।

পরিবারের মধ্যে অরবিন্দ (মায়ের পাশে)।

সাহেবি পরিবেশে থেকেও তাঁর পরিবর্তন হয়নি। রক্তমাংসের এক ভারতপ্রেমী হলেন। দরিদ্র, পরাধীন ভারতবর্ষ তাঁকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি তিনি পড়তে থাকেন। খুঁজতে থাকেন সনাতন আদর্শ, প্রবল পরাক্রম আর রাজমুকুটকে অনায়াসে ত্যাগ করার ঐতিহ্য। তিনি বরোদায় থাকার সময় প্রত্যুষে নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করতেন। নিজে রাখতেন দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলার একটি বইও। তিনি লিখে ফেললেন শক্তি আরাধনার অঙ্গ হিসেবে। সনাতন ঐতিহ্য যে ভারতীয়ত্ব সেই বোধ দৃঢ় হতে থাকল। অরবিন্দ এবার নিজের লক্ষ্য স্থির করলেন। বরোদায় থাকার সময় থেকে বঙ্গের বিপ্লবী সংগঠনের সংবাদ পাচ্ছিলেন। নিজেকে আর দূরে সরিয়ে রাখেবেন না তিনি। বঙ্গই হবে তাঁর এবার জীবনের শ্রীক্ষেত্র। পৃথিবী দেখবে বিপ্লবী অরবিন্দকে এবার।

সময়টা ১৯০৫। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সমগ্র বঙ্গ উত্তাল। জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতা তখন তীব্রতর হচ্ছে। ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন এদেশে ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিল। অরবিন্দ ঘোষ নির্বাচিত হলেন অধ্যক্ষ। বরোদার মহারাজের উচ্চ বেতনকে অনায়াসে ত্যাগ করে তিনি একশো পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরিতে যোগ দিলেন। উচ্চ আদর্শ, দেশপ্রেম এবং সমাসন্ন বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে তিনি অংশ নিতে চান। দেশের সেরা ছাত্র, উচ্চবংশীয় অরবিন্দ অক্লেশে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ গ্রহণ করেন। জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের সদস্যরূপে ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে তিনি যুক্ত হলেন। কি বিপুল মেধা আর পাণ্ডিত্য না থাকলে এমন অধ্যাপক হওয়া যায়!

অরবিন্দ প্রথাগত নন। প্রথাবিরোধী। কালের সৃষ্ট নন, কালের স্রষ্টা। নিশ্চিত চাকরি, ঝঞ্ঝাহীন জীবন তাঁর জন্য নয়। জীবনসমুদ্রে যদি তরঙ্গ না ওঠে, আদর্শায়িত তরঙ্গস্রোত যদি ভাসিয়ে না দেয় তাহলে কীসের জীবন! তিনি পড়েছেন ভারতের ইতিহাস। জেনেছেন দেশীয় ঐতিহ্য। আত্মস্থ করেছেন ভারতীয়ত্ব। তাঁর দেশ হিতৈষণার তিনটি দিক সবসময় সক্রিয়— প্রথমটি হলো, গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে স্বাধীনতার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা। তৃতীয় বিষয় হলো, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ সিংহের আস্ফালন বন্ধ করা। ১৯০৭ সালের ১৬ আগস্ট 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী প্রবন্ধ লেখায় গ্রেপ্তার হন এবং জামিনে মুক্তিও পান। পরে অভিযোগ থেকে মুক্তিলাভ করে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের আসরে যোগ দেন। এবার আর অধ্যক্ষ নয়। হলেন অধ্যাপক, কারণ তাঁর বিপ্লবী মন চাইতো তা হবে 'A centre of life'। এরপর তিনি চাকরি থেকে সরে এলেন।

বরোদায় থাকার সময়ই অরবিন্দ গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যোগসূত্র রাখছিলেন। ঠাকুর রামসিংহ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দেশাত্মবোধ প্রচার করতেন। রামসিংহ বিদেশ গেলে অরবিন্দ সেই গুপ্ত সমিতির নেতা হয়েছিলেন। বঙ্গপ্রদেশেও গুপ্ত সমিতি স্থাপনের চেষ্টা চলছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলাদেবী এবং ব্যারিস্টার পি. মিত্র কলকাতায় একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন গোরাদের অত্যাচার প্রতিহত করতে। সরলাদেবী ইংরেজদের অপমান নীরবে সহ্য না করার পরামর্শ দিয়ে 'বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল' নামে আস্ত একটি প্রবন্ধ লিখলেন। অবশ্য শক্তি সাধনার শ্রীক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৯০৬-এ অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার কলকাতায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'যুগান্তর' নামে একটি বাংলা কাগজ প্রকাশ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী 'যুগান্তর'-এ বেনামে অরবিন্দ লিখতেন জ্বালা ধরানো প্রবন্ধ। বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব এবার অরবিন্দের হাতে দিলেন।

অরবিন্দ অসম্ভব মেধাবী। দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় এমন মেধাবী রাজনীতিক তখন দু'একজন মাত্র। ফলে তিনি ও বিপিনচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্'-এ যেসব প্রবন্ধ লিখতেন তাতে রাজদ্রোহিতা আইনের চোখে প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হতো। 'বন্দে মাতরম্'-এর রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য মামলা হলো। দেশের এমন সব কর্মকাণ্ডে তো রবীন্দ্রনাথ চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। তিনি অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখলেন— 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি।'

অরবিন্দ ছিলেন ঋজু। আদর্শে দৃঢ়। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন শুরু হয় নরমপন্থী

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চরমপন্থী অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে। নরমপন্থীদের নিমন্ত্রণে জেলার পুলিশ সুপার সভাস্থলে উচ্চ আসনে বসে মিটিঙের অভূতপূর্ব শোভাবর্ধন করলে ক্ষোভে অরবিন্দ সভাস্থল ছেড়ে চলে যান। ১৯০৮ সালে মজফ্‌ফরপুরে অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি ভুল করে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি নামের দুই মহিলাকে হত্যা করেন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন। ক্ষুদিরাম ফাঁসিতে জীবন দিলেন। এই ঘটনা প্রবল আলোড়ন তোলে। এই ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশ বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ ইত্যাদি নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার করে। সেই রাত্রিতে গ্রে স্ট্রিটে 'নবশক্তি' কাগজের অফিসে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে ক্রেগন সাহেব। ক্রেগান প্রথমে তাঁকে হাতকড়ি পরালে আর এক পদস্থ পুলিশকর্তা বিনোদ গুপ্তের পরামর্শে তা খুলে ফেলেন। তাঁর কোমরে দড়ি পরানো হলো। ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন নরমপন্থী নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তাঁর প্রতিবাদে কোমর থেকে দড়ি খুলতে পুলিশ বাধ্য হয়। অরবিন্দ প্রথম থেকেই দুই নিরীহ মহিলার মৃত্যুর সঙ্গে নিজের যোগসূত্রের কথা অস্বীকার করেন।

জেলের নির্জন কক্ষে বন্দি থাকার সময় অরবিন্দের মনে হতে থাকে তিনি আর এখন একা নন। স্বয়ং বাসুদেব তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। ফলে জেলের ক্লেশের দিনগুলো শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে হয়ে উঠল আত্মদর্শন ও অধ্যাত্ম যোগের মঙ্গলকাব্য। ব্রিটিশ ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব যেসব ধারায় অরবিন্দকে অভিযুক্ত করেছিলেন তাতে মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উঠে পড়ে লাগলেন অরবিন্দকে মুক্ত করতে। মামলার খরচ চালাতে গিয়ে চিত্তরঞ্জনকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনা করতে হয় এবং সাধের গাড়িটিও বিক্রি করতে হয়। স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে বরাভয় দিয়েছিলেন। অরবিন্দ সম্পর্কে আবেগমথিত ভাষায় দেশবন্ধু আদালত কক্ষে বললেন— 'লোকে তাঁকে স্মরণ করবে দেশপ্রেমের কবি বলে; স্মরণ করবে তাঁকে জাতীয়তাবাদের ঋষি বলে; স্মরণ করবে তাঁকে বিশ্বপ্রেমিক বলে। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর বাণী শুধু ভারতে নয়, দেশে-দেশান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলি, আজ কেন আপনাদের সম্মুখেই তাঁর বিচার হচ্ছে না, তাঁর বিচার হচ্ছে ইতিহাসের বিচারালয়ে।'

'ইতিহাসের বিচারালয়ে' অরবিন্দ হবেন উজ্জ্বলতম ব্যক্তি। দেশেপ্রেম আর মেধাবী স্থিতধী উপস্থিতি নিয়ে এই রাজদ্রোহী কালে হবেন বিশ্ববন্দিত। ১৯০৮ সালের ৫ মে থেকে ১৯০৯ সালের ৫ মে এই এক বছর ছিল তাঁর কারাবাস। শুধুই কারাবাস? না। আত্মপ্রজ্ঞা, ভক্তির পরমার্থ, আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও স্নায়ুযুদ্ধ জয়ের এক গৌরবময় বিজয়কাব্য রচনা করলেন অরবিন্দ। এবার হবেন তিনি ঋষি। শ্রীঅরবিন্দ।

আলিপুর বোমা মামলায় মুক্তি পেলেও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আবার কারারুদ্ধ করার জন্য নানা ফিকির খুঁজতে ব্যস্ত। ভগিনী নিবেদিতা পরামর্শ দিলেন অরবিন্দ যেন ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করেন। তিনিও সম্মত হন। তার আগে ৩০ জুলাই 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন। চিঠির মূল কথা হলো জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য হোক পূর্ণ স্বাধীনতা। তাদের কর্মপন্থা দুটি— সাবলম্বন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মানে ব্রিটিশ সরকারকে সামান্যতম সহযোগিতা না করা।

হাইকোর্টের পুলিশ সুপার সামসুল আলম নিহত হলে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আবার তৎপর হলো। অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' পত্রিকা অফিস থেকে চলে গেলেন চন্দননগর। কিন্তু চন্দননগরও বিশেষ নিরাপদ নয়। স্থির হয় পয়লা এপ্রিল চাঁদপাল ঘাট থেকে 'ডুপ্লে' নামের ফরাসি জাহাজে গোপনে

ত্রিশ বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ

তিনি ফরাসি শাসিত পণ্ডিচেরী যাবেন। অরবিন্দের ছদ্মনাম হলো যতীন্দ্রচরণ মিত্র। সহযোগী বিজয়কুমার নাগের পরিবর্তিত নাম বঙ্কিমচন্দ্র বসাক। নানা বাধার পর ৪ এপ্রিল তাঁরা পণ্ডিচেরী আসবেন।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই তাঁর পণ্ডিচেরী আগমন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফরাসি প্রভাবিত পণ্ডিচেরীর বাইরে আনার জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হবে নাই-বা কেন। গভর্নর জেনারেল মিন্টো তাঁকে মনে করতেন 'দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস ম্যান'। ফরাসি পুলিশ তাঁর আশ্রমে তল্লাশি করে গ্রিক ও লাতিন ভাষায় লেখা কতকগুলি পাণ্ডুলিপি পায় মাত্র। 'দ্য লাইফ ডিভাইন'-এর মেধাবী ব্যক্তিত্ব ও পূত চরিত্রের জন্য পুলিশও পরিণত হলো ভক্ত শিষ্যে!

ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের জন্য শ্রীঅরবিন্দ স্মরণীয়। চিত্তরঞ্জন দাশ বর্ণিত 'ইতিহাসের বিচারালয়ে' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উন্মুক্ত অসভ্যতার বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ হয়ে উঠলেন উপনিষদের চিরন্তন ধ্যানভূমি। □

অমৃতের অভিযাত্রী

পক্ষীরাজ গরুড়ের অমর আত্মত্যাগের কাহিনি

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী

সুদূর অতীতে, যখন পৃথিবী, স্বর্গ ও পাতাল— এই তিন লোকের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ ছিল, তখন মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম ছিল জ্ঞান, তপস্যা ও শান্তির এক অনন্য কেন্দ্র। মহর্ষির অন্যান্য পত্নীর মধ্যে ছিলেন দুই বোন— বিনতা ও কদ্রু। ভাগ্যের বিচিত্র খেলায় এই দুই বোনের জীবনে একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা পরবর্তীকালে সমগ্র সৃষ্টিজগতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রইল।

বিনতা ছিলেন শান্ত, সত্যবাদী ও সহৃদয়া। অপরদিকে, কদ্রু ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কিন্তু কখনো কখনো সেই বুদ্ধি তাঁকে প্রতারণার পথেও পরিচালিত করত। একদিন তাঁরা স্বর্গীয় অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়লেন। কদ্রু প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বিনতাকে পরাজিত করলেন। শর্ত অনুযায়ী, বিনতাকে কদ্রুর দাসত্ব স্বীকার করতে হলো। সেদিন থেকে বিনতার জীবন হয়ে উঠল অসহনীয় দুঃখ ও অপমানের প্রতীক। কিন্তু নিয়তি তখনও তাঁর জন্য এক মহৎ পরিকল্পনা গোপন করে রেখেছিল।

অনেক বছর পরে, বিনতার প্রসব করা ডিম থেকে জন্ম নিলেন এক আশ্চর্য শক্তিধর সন্তান— গরুড়। জন্মের মুহূর্তেই তাঁর শরীর থেকে নির্গত আলোকরশ্মিতে আকাশ, বাতাস ও পৃথিবী কম্পিত হয়ে উঠল। তাঁর ডানা প্রসারিত হতেই পর্বত কেঁপে উঠল, সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল এবং দেবতারা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

জন্মের পরে গরুড় মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মা, তোমার এত কষ্টের কারণ কী?' বিনতা বহুদিনের লাঞ্ছনা, অপমান ও দাসত্বের ঘটনা তাঁর পুত্রকে শোনালেন। গরুড়ের হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল। তিনি বুঝলেন, প্রকৃত শক্তি নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠায় নয়, মায়ের দুঃখমোচনে ব্যবহৃত হওয়াতেই নিহিত। পরদিনই গরুড় কদ্রুর সন্তান নাগেদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আমার মায়ের মুক্তির শর্ত কী?'

নাগরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারা বলল 'স্বর্গ থেকে দেবতাদের রক্ষিত অমৃত এনে দিতে পারলে তোমার মা মুক্তি পাবে।'

এই শর্ত অসম্ভব ছিল, কারণ অমৃত রক্ষা করতেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, অসংখ্য দেবসেনা এবং ভয়ঙ্কর সব ঐশ্বরিক শক্তি। কিন্তু গরুড় এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না। তিনি জানতেন, মায়ের মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে তাঁকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে। যাত্রার আগে তিনি মায়ের আশীর্বাদ নিতে গেলেন। বিনতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'পুত্র, আমি তোমার জীবন বিপন্ন করতে চাই না।'

গরুড় মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'মা, যে নিজের সুখের জন্য বাঁচে, সে একটি সাধারণ পশু; কিন্তু যে মা-বাবার বা অন্যের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, সেই তো সত্যিকারের বীরপুরুষ। মা, তুমি আমাকে বীরপুরুষ হওয়ার আশীর্বাদ দাও।'

এই বলে তিনি আকাশে উড়ে উঠলেন। গরুড়ের যাত্রাপথ ছিল দুরূহ ও বিপদসংকুল। নানা বাধা অতিক্রম করে অবশেষে তিনি পৌঁছালেন দেবলোকের দ্বারে। দেবসেনারা বিস্মিত হয়ে দেখল, এক মহাপরাক্রমশালী পক্ষীরাজ অমৃতের উদ্দেশে ধেয়ে আসছেন। শুরু হলো এক ভয়াবহ যুদ্ধ। সেখানে বজ্র, অগ্নিবাণ, দিব্যাস্ত্র সবকিছুই ব্যবহৃত হলো। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বজ্রাঘাতে গরুড়ের শরীর রক্তাক্ত বলো, কিন্তু তিনি থামলেন না।

ইন্দ্র বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহাবীর, তুমি কি অমরত্ব লাভের জন্য এই যুদ্ধ করছ?' গরুড় উত্তর দিলেন, 'না, দেবরাজ। আমি নিজের জন্য কিছু চাই না। আমি কেবল মায়ের মুক্তি চাই।' এই উত্তর শুনে দেবতারা স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

যে যোদ্ধা নিজের লোভের জন্য নয়, অন্যের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে, তাকে পরাজিত করা যায় না। এই সত্য তাঁরা উপলব্ধি করলেন।

অবশেষে গরুড় অমৃতের পাত্র লাভ করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ভগবান বিষ্ণু তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে। ;বললেন, 'গরুড়', 'তুমি চাইলে এই অমৃত পান করে অমর হতে পারো।' গরুড় বিনম্রভাবে মাথা নত করলেন। 'প্রভু, আমি নিজের জন্য কিছু চাই না। যদি আশীর্বাদ দিতেই চান, তবে আমাকে এমন শক্তি দিন, যাতে আমি সর্বদা ধর্ম, সত্য ও কর্তব্যের পথে অবিচল থাকতে পারি।' ভগবান বিষ্ণু গভীর সন্তোষে বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার বাহন হবে এবং তোমার নাম যুগযুগ ধরে সাহস, আত্মত্যাগ ও মাতৃভক্তির প্রতীক হয়ে থাকবে।'

গরুড় অমৃত নিয়ে নাগদের কাছে ফিরে এলেন। মায়ের মুক্তি নিশ্চিত করার পর তিনি অমৃত এমন স্থানে রেখে দিলেন, যাতে দেবতারা পরে তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন। তিনি কখনো নিজের অমরত্বের জন্য এক বিন্দু অমৃত স্পর্শও করলেন না। সেদিন বিনতা মুক্ত হলেন। মায়ের মুক্তির আনন্দ গরুড়ের বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হয়ে উঠল।

অনেক যুগ পরে, যখন ঋষিরা তাঁদের শিষ্যদের পক্ষীরাজ গরুড়ের বীরত্বের কাহিনি শোনাতেন, তখন তাঁরা বলতেন, শক্তিশালী হওয়া বড়ো কথা নয়; শক্তিকে কীসের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাই প্রকৃত পরিচয়। □

দেশ কাঁপানো কয়েকটি দিন

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

অনুভা সেনকে আজকের প্রায় কেউ চেনেন না, ঊর্মিলা বাঈকেও নয়, যারা বোম্বেতে তাদের নেত্রী কমল ডোণ্ডের নির্দেশ মতো নৌবাহিনীতে ঢুকে, অফিসারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ব্রিটিশ রণসজ্জার খবর জোগাড় করে, গোপনে গোপনে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দকে সাহায্য করবেন ঠিক করেছিলেন। এদের একনিষ্ঠ উদ্যোগেই, সলতে পাকানোর পর্ব শেষেই আরআইএন অর্থাৎ রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিতে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নৌবাহিনীর সেই ছ'দিনের বিদ্রোহের কথায় যাবার আগে ওই প্রস্তুতির পর্ব, অনুভা আর ঊর্মিলা'র আত্মত্যাগের পর্বটিও আজ স্মরণ করা যাক।

সেনাবাহিনীতে যে বিদ্রোহের আয়োজন চলছে, তা ব্রিটিশ প্রথম জানতে পারে চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিদ্রোহের পরে, ১৯৪৩-এর গোড়ার দিকে। দ্বিতীয়বার বিদ্রোহের দিন ঠিক হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪। কিন্তু তার দু-দিন আগে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন অনুভা সেন এবং তার সঙ্গী মহারাষ্ট্রবাসী ঊর্মিলা বাঈ। এঁরা সর্বভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাতে উইমেন্স রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিতে ঢুকেছিলেন, কমল ডোণ্ডের নির্দেশমতো কাজকর্ম করতেন। একটা বড় কিছু ঘটতে চলেছে, তা ব্রিটিশ বুঝতে পারল ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ অনুভা সেন-ঊর্মিলা বাঈ গ্রেপ্তারের সময় তাদের হেপাজতে থাকা বিদ্রোহ সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র থেকে। বিদ্রোহের পূর্ণ রূপরেখাটি বোঝার তাড়নায় এই দু'জনের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালান হলো, প্রায় একমাস ধরে। অনুভা সেন নৌবাহিনীতে চাকরি নিয়েছিলেন ১৯৪২ সালের শেষের দিকে; ঊর্মিলা ১৯৪১-এর মাঝামাঝি। অফিসে কেরানির কাজ, নার্সিঙের পাশাপাশি সমিতির জন্য একটি কঠিন কাজ করতেন তারা। তা হলো, অফিসারদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক পাতিয়ে ব্রিটিশ রণসজ্জার খবরাখবর জোগাড়। সবই করতেন নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা ভেবে।

১৯৪৪-এর এই নৌবিদ্রোহ অসফল হবার পর সব বন্দিকে জড়ো করা হলো বোম্বের মুলুন্দ বন্দি শিবিরের ভেতরের খোলা চত্বরে, ৩১ মার্চ ১৯৪৪। দেড়হাজার বন্দির সঙ্গে আছেন অনুভা। প্রত্যক্ষদর্শী ফণিভূষণ ভট্টাচার্য বলছেন, 'তাঁদের (অনুভা-ঊর্মিলা) দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কী-না অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তাঁদের ওপরে। তাঁদের সমস্ত জামাকাপড় রক্তে ভেজা। কোনো কোনো স্থানে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়েও আছে। নিম্নাঙ্গ থেকে পা বেয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছিল। মুখমণ্ডলের প্রায় সর্বত্র দেখা গিয়েছিল বীভৎস কামড়ের চিহ্ন। কোনো কোনো স্থানের মাংসপিণ্ড ছিঁড়েও গিয়েছিল। তা দিয়েও রক্ত গড়াচ্ছিল। তাঁদের সুন্দর সুঠাম দেহের ওপরে পড়েছে নীল ছাপ। তবুও কিন্তু তাঁদের প্রখর দৃষ্টির মধ্যে একটা অনির্বচনীয় বজ্র-দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল; এবং তা ধরাও পড়ল তাঁদের উচ্চরবের ধ্বনির মধ্যে— ভারতের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

রিয়াল অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে পড়ে শোনালেন কোর্ট মার্শালের রায়। সারমর্ম হলো— ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ব্রিটিশরাজকে উচ্ছেদ করবার গভীর চক্রান্তে যুক্ত থাকবার অপরাধে তরুণী দু'জনকে গুলি করে হত্যা করা হবে এবং দেড় হাজার বিদ্রোহীকে ভোগ করতে হবে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। যেতে হবে মুলতান (এখন পাকিস্তানে) সামরিক কারাগারে। রায় পাঠ করে

ফঃ ৫

শোনাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অ্যাকশন। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হলো মহিলা দু'জনকে। দু-জন মহিলাকে মারতে ধার্য হলো চারজন গোরা সৈন্য। ট্রিগার টেপবার আগে অনুভা-ঊর্মিলা উচ্চারণ করলেন— আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, জয় হিন্দ। তারপরেই চাঁদমারির দেওয়ালে লুটিয়ে পড়ল তাদের রক্তাক্ত দেহ। তাঁদের হত্যা করা হলো ঠিকই, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করা গেল না? যায় নি, যায় না। অসাম্য থাকলে, তার বিরুদ্ধে সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মেই প্রতিবাদ হয়, বিদ্রোহীদের জন্ম হয়।

এই ধারা মেনেই ছেচল্লিশের নৌবিদ্রোহের শুরু। তার কাহিনি শোনা যাক। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, নৌবিদ্রোহের প্রথম দিন। কেন এই বিদ্রোহের শুরু? সাধারণত, দেশের প্রতিরক্ষার কাজে যারা থাকেন, তাঁরা চট করে বিদ্রোহ করেন না; তবে পরাধীন ভারতে কী এমন ঘটল যে, তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন শক্তিশালী ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে? সে-কথা বুঝতে, এর আগের কয়েকটি ঘটনা জানা দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির সেনা সংগ্রহ করা হতো মূলত পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের থেকে। অফিসার পদগুলি নির্দিষ্ট ছিল ব্রিটিশদের জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটে পড়ে ব্রিটিশরা বাধ্য হয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে সেনা সংগ্রহ করতে, অফিসার পদেও নেওয়া হয় কিছু ভারতীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, ভারতীয় বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ মাত্র, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে তা বহুগুণ বেড়ে কুড়ি লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছয়। ব্রিটিশ অফিসারদের জোগান কমে আসায় ভারতীয়রা অনেক বেশি সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে ঢোকবার সুযোগ পান। ফলত, সেনাবাহিনীতে দেশপ্রেমের বোধ অনেক বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমশ, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন, এমন অফিসারদের একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে। সেনাবাহিনীর নাম এক হলেও, এর মধ্যে ব্রিটিশ কর্মচারী আর ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবধান রাখা হতো--- গোরা সৈনিকদের জন্য তুলনামূলক ভালো খাবার, কামরা, স্নানঘর— এসবের ব্যবস্থা, কিন্তু তাদের মতো খাবার ভারতীয় সৈনিকদের জোটে না, এবং তাদের স্নানঘর-কামরায় ভারতীয় সৈনিকদের প্রবেশ নিষেধ! অথচ কর্মদক্ষতায় এ দেশের মানুষ কারও চেয়ে কম নয়। এই বিভেদ অসন্তোষ তৈরি করল ভারতীয় সৈনিকদের মনে।

১৯৪৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সৈনিকদের ভারতে ফিরিয়ে এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার উদ্যোগ নেওয়া হতেই, খবর পৌঁছে যায় রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির সেনা বা রেটিংদের মধ্যে। তারা বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা গোপনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আইনি লড়াইয়ের সমর্থনে দান সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়।

নৌবিদ্রোহের যিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র সেই বলাইচন্দ্র দত্ত ছিলেন বেতার টেলিগ্রাফ কর্মী। ভারত মহাসাগর ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে নৌযুদ্ধের কাজে যুক্ত ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন যে বিশেষ যুক্ত বাহিনী গঠন করেছিলেন, তাতেও বলাইচন্দ্র নির্বাচিত হন। এক বছর বহ্মদেশের যুদ্ধে কাটিয়েছেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পর ওই বাহিনী ভেঙে দেওয়া হলে ওকে বদলি করে আনা হয় বোম্বের তীরে নোঙর করা জাহাজ এইচ.এম.আই.এস তলোয়ারে-এ। ওই জাহাজ তখন সিগন্যাল স্কুলে রূপান্তরিত। এইখানেই তাঁর বন্ধু এসএম শ্যাম মালয় থেকে ফিরে শোনালেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর নানান বীরত্বের কাহিনি। তিনি এনেছিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের কোনো-কোনো সভ্যের লেখা চিঠি, যা গোপনে পৌঁছে দিতে হবে নেহরু কিংবা শরৎচন্দ্র বসুকে। এই কাজে জড়িয়ে গেলেন বলাই। এইসব ব্যাপারে যুক্ত থাকা রাজদ্রোহিতার শামিল। তবু আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্ব এতটাই উদ্বুদ্ধ করে বলাই প্রমুখ নৌসেনাদের, এই কাজে জড়িয়ে যান। তাঁরা গোপনে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকেন 'আজাদ হিন্দি' হিসাবে। নয় নয় করে কুড়িজন জুটে যায় এইসব গোপন কাজে। শুরু হয় আড়ালে থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে অপদস্থ করবার চেষ্টা।

১ ডিসেম্বর ১৯৪৫। নৌদিবস পালন করবার কথা। বাহিনীর কীর্তিকলাপ দেখাতে অসামরিকদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আগের রাতে কারা যেন সব ব্রিটিশ পতাকা পুড়িয়ে দিল! তলোয়ার জাহাজের ভেতর জঞ্জালের স্তূপ! পোড়া পতাকার কাপড়ে ভরে গেছে প্যারেডের মাঠ! দেওয়ালে স্লোগান— ভারত ছাড়ো, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, এখনই বিদ্রোহ কর, গোরাদের হত্যা কর! কর্তৃপক্ষ দিশেহারা। অসামরিকদের জন্য প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আগে দ্রুত সাফাই অভিযান চালিয়ে কোনওরকমে মুখরক্ষা হলেও, ব্রিটিশরা চিন্তিত। বিদ্রোহের বীজ ঢুকল কী করে! এইসময়েই বলাইদের দলের একজন, আর কে সিংহ, পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন এই কথাটি খুব ভালোমতো জেনেই যে, নৌবাহিনীর লোকদের পদত্যাগের অধিকার নেই— এ তো সোজাসাপ্টা বিদ্রোহ! তিনমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হলো আর কে সিংহ-কে।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬— কমান্ডার-ইন-চিফ অচিনলেক তলোয়ারে আসবেন সেনাদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে। ওইদিন ভোরবেলায় দেখা গেল অভিনন্দন গ্রহণের বেদীর ওপরে লেখা--- 'জয় হিন্দ, ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো...'

ব্যারাকে-ব্যারাকে তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। আগের কাজগুলোতে ধরা পড়েননি, কিন্তু এইবার প্রমাণ সমেত ধরা পড়ে গেলেন বলাই। তাকে নিয়ে আসা হল অভিনন্দন গ্রহণের বেদির সামনে। কমান্ডিং অফিসার কিং দাঁড়িয়ে, মুখ রক্তবর্ণ— তোমার এই কাজের ফল কী তুমি জানো?

কিপ কোয়ায়েট...তোমার কামানের সামনে দাঁড়াতে আমি তৈরি, বললেন বলাই। বলেই, অনুমতির তোয়াক্কা না করে একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। কিং হতবুদ্ধি, চূড়ান্ত অপমানিত। বেদী থেকে নেমে এসে বলাইচন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা শুরু করতে যাবেন, বিদ্রোহী সৈনিক সোজা বলে দিলেন, সরি, আমি এখন কথা বলতে পারব না। কারণ, ইচ্ছে করছে না। পরের দিন, কয়েকটি ভারতবন্ধু পত্রিকায় বেরিয়েও গেল এই ঔদ্ধত্যের খবর।

৮ ফেব্রুয়ারি কমান্ডিং অফিসার কিং যাচ্ছিলেন ব্যারাকের পাশ দিয়ে। হঠাৎ বেড়ালের ডাক শুরু হয়ে গেল। অপমানিত কিং ব্যারাকে ঢুকে সবাইকে চাবুক কষালেন— ইয়ু সান্স অফ বিচেস, সান্স অফ কুলিজ, সান্স অফ ব্লাডি জাংলিজ...।

ঠিক হলো, বলাইকে রয়াল ইন্ডিয়ান নেভি থেকে বরখাস্ত করা হবে। কাগজপত্র তৈরি হতে-হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি। তাকে বলা হলো এই সময়টা তিনি ইচ্ছে করলে কমান্ডিং অফিসারের কোয়ার্টার, যা খালি পড়ে আছে, সেইখানে থাকতে পারেন অথবা ব্যারাকে। তার বন্ধু, সহকর্মীরা যেখানে থাকে বলাই সেই

ব্যারাকেই থাকলেন।

এইবার মুখোমুখি লড়াই। ভারতীয় নৌসেনারা ভেতরে-ভেতরে আগুন হয়ে আছে। যে কোনও রকমের বিশৃঙ্খলাকে তারা আহ্বান করতে প্রস্তুত। প্রতিনিয়ত পাওয়া ছোটো-ছোটো অপমান জমে আজ পাহাড়। সেই পাহাড়কে সরাতে হবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে ঠিক হলো খারাপ খাবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিয়ে শুরু করতে হবে। এমনভাবেই ১৯৪৪-এ একবার বিদ্রোহের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।

১৮ তারিখে ভোর পাঁচটায় নিয়মমতো তলোয়ারে রেটিং-দের জাগানো হলো। রুটিনমাফিক সকাল আটটায় প্রায় পনেরশো রেটিং চলে এল প্রাতরাশ করবার মেসের কামরায়। হঠাৎ চাপা গুঞ্জন, কে শুরু করল কেউ জানে না--- খাবার খারাপ, অত্যন্ত নীচু মানের...। শুরু হয়ে গেল হইচই চিৎকার। শতাধিক রেটিং স্লোগান দিল—নো ফুড, নো ওয়ার্ক। নৌবাহিনীর আইন অনুযায়ী এ সরাসরি বিদ্রোহ।

অফিসাররা হতভম্ব। দু'জন ভারতীয় অফিসার এল ঘুরে দেখতে। রেটিংদের তাড়া খেয়ে পালাল। এমন অভাবিত বিদ্রোহের ধাক্কায় কর্তৃপক্ষ বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। এদিকে বিদ্রোহী আজাদ হিন্দিরা সব রেটিংদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, এ শুধু খাবারের লড়াই নয়, এ এমন এক লড়াই যার মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে যে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার ভাড়াটে খুনি নই, আমরা যোদ্ধা, আমরা ভারতের স্বাধীনতা আনবার সৈনিক, আমরাই পারি রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির দখল নিতে, তখন জাতীয় নেতারাই বলে দেবেন কী করতে হবে এইবার। নেতারা যে কাজ করবার চেষ্টা করছেন এত বছর ধরে আমরা সে কাজ করব অল্প কয়েকদিনেই। জাহাজের দখল নিয়ে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে তেরঙা পতাকা।

প্রথম পাঁচঘণ্টা কিছুই করতে পারল না ব্রিটিশ অফিসাররা। দুপুর একটার সময় তলোয়ারে এলেন ফ্ল্যাগ অফিসার রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে। সঙ্গে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোন্স। প্রস্তাব দিলেন রেটিংদের অপছন্দের কমান্ডার কিংকে বদলি করে দিয়ে তার জায়গায় আনা হবে জোন্সকে, খাবারের মানও উন্নত করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কাজ হলো না।

অনুষ্কা সেন ও উর্মিলা বসু

রেটিংরা দাবি জানাল ভারতীয় অফিসারের। স্লোগান উঠল— 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো'।

দুপুর তিনটেয় কমান্ডার কিং বলাইচন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়ে চেষ্টা করলেন মিটমাটের। বলাই অনড়। ইতিমধ্যে রেটিংরা দলবেঁধে কিং-এর অফিস ঘেরাও করে ফেলেছে। কিং বিচলিত। সে তলোয়ার ছেড়ে চলে গেল। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ তলোয়ারের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের সব চিহ্ন উধাও। রেটিংরাও কিঞ্চিৎ হতভম্ব, তাদের ওপর হুকুম জারি করবার আর কেউ নেই জাহাজে, নিজেদের স্পর্ধায় তারা নিজেরাই অবাক!

বিদ্রোহী নেতারা রেটিংদের বোঝাতে শুরু করলেন। গঠন করা হলো ধর্মঘট কমিটি। দাবির তালিকায় উন্নত ধরনের চাকরির ব্যবস্থা এবং খাদ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো কিছু রাজনৈতিক দাবিও— আইএনএ সৈনিক-সহ সব রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে আনা, কিং-কে শাস্তি দেওয়া, ইংরেজদের ভারত ছাড়তে হবে...ইত্যাদি।

সন্ধে ছ'টায় অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো ঘোষণা করে দিল ধর্মঘটের খবর। রেটিংদের দাবির বহর দেখে বোম্বের সংবাদপত্র জগৎ হতবাক। তারা উত্তেজিত। তাহলে, পরাধীন ভারতে এমন লড়াই শুরু করা যায়! ফ্রি প্রেস জার্নাল সংবাদপত্র দায়িত্ব নিল লড়াইয়ের খবর ছাপবার।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। সকালবেলায় বোম্বে তীরের ক্যাসেল ব্যারাকের নাবিকদের কাছে খবর পৌঁছে গেল— ভাইসব তলোয়ার মুক্ত, তোমরাও চলে এস দেশ মুক্ত করবার লড়াইতে। ক্যাসেল ব্যারাকের নাবিকদের রক্তে আগুন ধরে গেল, তারা উন্মত্তের মতো দৌড়তে লাগল প্রধান রাস্তায়, আশপাশের যেখানে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক টেনে নামাল সব, বিদেশি দোকান আক্রমণ করল, বিদেশিরাও ভয়ে দৌড় দিল লুকিয়ে পড়বার

জন্য। দিনের শেষে বোঝা গেল, তলোয়ার আর একা নয়। তীরবর্তী ১১টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০, ০০০ রেটিং একত্র হয়েছে, বন্দরের সব জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক। সন্ধ্যে নাগাদ গঠন করা হলো কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি— নেভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি (এনসিএসসি)। সভাপতি এম এস খান, সহ-সভাপতি মদন সিংহ, দু'জনেই ছাব্বিশ পেরোননি তখনও। বলাইচন্দ্রও কমিটিতে ছিলেন, ওনার বয়েস বাইশ। রেটিংদের মধ্যে সেদিন সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান ছিল না।

পরদিন সকালে দেখা গেল, ভারতীয় নৌসৈন্যের সবক'টি সংস্থা থেকেই ব্রিটিশরা তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে! ইতিমধ্যে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছে ৭৪টি জাহাজে, চারটি বড়ো ঘাঁটি-সহ চারটি ফ্লোটিলা এবং কুড়িটি তীরবর্তী প্রতিষ্ঠানে। তলোয়ার জাহাজের আজাদ হিন্দ আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ যেন দাবানল জ্বালিয়ে দিল! করাচীর আশপাশেও বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। ওইখানকার নেতা হিন্দুস্থান জাহাজ। ব্রিটিশদের আক্রমণ অবলীলায় প্রতিহত করেছে। বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজগুলির সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হলো জাহাজের বেতারযন্ত্রকে, আবিষ্কার করা হলো নতুন সংকেতের। আরআইএন-এর নতুন নামকরণ হলো আইএনএন— ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি। ভারতীয় জাতীয় নৌবাহিনী। কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি ঘোষণা করে দিল— বিদেশিদের থেকে নয়, কেবলমাত্র জাতীয় নেতাদের কাছ থেকেই নির্দেশ নিতে হবে রেটিংদের। দেশের লোকদের জানান দরকার রেটিংদের এই বিদ্রোহের খবর। সে কাজ খুব ভালোই করে চলেছে ফ্রি প্রেস জার্নাল।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এত কিছুর পরেও কোনও জাতীয় স্তরের নেতা এগিয়ে এলেন না নেভাল রেটিংদের বিদ্রোহের সমর্থনে। অরুণা আসফ আলির ওপর ভরসা ছিল রেটিংদের, কিন্তু উনি উপদেশ দিলেন শান্ত থাকবার। তারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের কাছে গেল, কিন্তু কোনও সুরাহা হলো না।

তবু বোম্বে শহরে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকল। জাতীয় একতার ডাকের ধ্বনিতে একত্রে প্রতিবাদ— বোম্বের রাস্তা ধরে মিছিল করল রেটিংরা। কোনো-কোনো জায়গায় সংঘর্ষ হলো পুলিশের সঙ্গে, তবু থামা নেই।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির নেতারা বুঝে গেলেন, হয় এগিয়ে যেতে হবে একাই, নয় চাকরির কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করে আন্দোলনে রাশ টানতে হবে।

দুপুরবেলা ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং রয়াল ইন্ডিয়ান নেভি (এফওসিআরআইএন) ভাইস অ্যাডমিরাল গডফ্রে এসে গেলেন বোম্বেতে। আলোচনায় ডাকলেন কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির নেতাদের।

আলোচনা শেষে সমিতি গডফ্রে-র কাছ থেকে এই অনুরোধ নিয়ে ফিরে এল যে বিকেল তিনটের মধ্যে সব রেটিংকে ফিরে যেতে নিজের কাজের জায়গায়। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় মিলিটারি পুলিশের গাড়ি এসে যে রেটিংকে রাস্তায় পেল তুলে নিতে থাকল। বোঝা গেল, এইবার দমন-পীড়ন শুরু হতে চলেছে। পুলিশ প্রহরা শুরু হয়ে গেল সর্বত্র। প্রতিবাদের আর কোনও উপায় না দেখে রেটিংরা শুরু করলেন অনশন ধর্মঘট।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালেও রেটিংরা বেরিয়ে আসতে পারছিল তলোয়ার ও ডক থেকে। কিছু পরেই ক্যাসেল ব্যারাক ও ডকইয়ার্ড বরাবর ব্রিটিশ সৈন্যদের ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সকাল ন'টায় ভারতীয় সৈন্যরা ক্যাসেল ব্যারাকের রেটিংদের ওপর গোলা বর্ষণ করল। রেটিংরা লাউডস্পিকারে তাদের উদ্দেশে বলল, ভাইসব আমরা কেবল নিজেদের জন্য যুদ্ধ করছি না— করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য— এ যুদ্ধ তোমাদেরও...'। বন্ধ হলো গোলার আওয়াজ। এক সৈনিক সংকেতে জানিয়ে দিল তারা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছিল এতক্ষণ! কিছু পরেই ভারতীয় সৈন্যদের মার্চ করিয়ে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হলো।

বেলা এগারোটার সময়ে ব্রিটিশ সৈন্য পরবর্তী আক্রমণ শুরু করল। রেটিংরা দাঁড়িয়ে গেছে যুদ্ধ করবার ভঙ্গিতে। আর অহিংস আন্দোলন, অনশন ধর্মঘট নয়, এইবার তাদের জানাচেনা ভঙ্গি— সশস্ত্র যুদ্ধ। লড়াইয়ের জায়গাটি তলোয়ার থেকে সরিয়ে নেওয়া হল ফ্ল্যাগ শিপ নর্মদায়। বন্দরের সব জাহাজে নির্দেশ পাঠান হলো যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার— রেজ স্টিম অ্যান্ড প্রিপেয়ার ফর অ্যাকশন স্টেশনস। বলা হলো সমগ্র বোম্বে শহরের চারধারে দাঁড়াবার প্রয়োজন হতে পারে।

ব্রিটিশরা উদ্যোগ নিল জাহাজে রসদ বন্ধ করে দেওয়ার। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসে জড়ো হলো সমুদ্রতীরে। তাদের হাতে খাবারের প্যাকেট, জল। রেস্তোরাঁ মালিকরা জনগণকে অনুরোধ করল যতখুশি খাবার নিয়ে অবরুদ্ধ রেটিংদের দিয়ে আসতে। কাঁধে বন্দুক নিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা ওইসব খাবারের প্যাকেট জাহাজ থেকে পাঠান ছোটো-ছোটো নৌকায় তুলে দিতে সাহায্য করল। বোম্বের তীর অধিগ্রহণ করে নিয়েছে সাধারণ মানুষ। ব্রিটিশ সৈন্যরা অসহায়ভাবে দেখছিল সব!

ডক-ইয়ার্ডে অথবা ক্যাসেল ব্যারাকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রবেশ করবার সমস্ত প্রচেষ্টা প্রতিহত করে দিল বিদ্রোহী রেটিংরা পাল্টা গুলি চালিয়ে। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে গডফ্রের ঘোষণা শোনা গেল— সরকারের সমস্ত সশস্ত্র শক্তি নিয়োগ করা হবে এ বিদ্রোহ দমনে— নৌবহর ধ্বংস করতেও তারা দ্বিধা করবে না...। বোঝা গেল ব্রিটিশরা ভয় পেয়েছে, তাই এই ফাঁকা আওয়াজ।

এক বার্তা এল এনসিএসসি-র কাছে— গডফ্রে পরিস্থিতি নিয়ে আবার আলোচনা করতে ইচ্ছুক। সিজ ফায়ারের নির্দেশ দিল কমিটি। ক্যাসেল ব্যারাকে খবর এল গডফ্রে নিজে আসছেন আলোচনা করতে। কিন্তু উনি এলেন না। আসলে চক্রান্তকারী মনোভাবের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আলোচনার নাম করে দম নিতে চাইছিল, কিন্তু মুখোমুখি লড়াইয়ে অভ্যস্ত বীর বিদ্রোহীরা ভুল বুঝে সেই ফাঁদে ধরা দিল। খবর এল, নৌ-কর্তৃপক্ষ জাতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। আলোচনার টেবিলে যে সময় ব্যয় হয়, তার মধ্যেই ব্রিটিশদের রয়েল নেভির জাহাজগুলি তৈরি হবার সুযোগ পেয়ে গেল। দিল্লির জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে ঘোষণা করা হয়— জল ও স্থলবিভাগের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল বোম্বে, করাচী ও পুণা অভিমুখে রওনা হয়েছে।

তখনও, জল-স্থল-অন্তরীক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার সময়েও, রেটিংদের আশা লড়াই করলে কিছু মূল্য দিয়েও তাদের জয় হবেই। তারা বুঝেছিল, রেটিংদের লড়াইয়ে জনসাধারণের সমর্থন আছে। তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে দখল নেওয়া সবক'টি জাহাজের মাস্তুলে পতপত করে উড়ছে ভারতের জাতীয় দলগুলির পতাকা। রেটিংরা দেখিয়ে দিয়েছে অস্ত্র হাতে ব্রিটিশদের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব। লড়াইতে তখনও অবধি দশজন

ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ভারতের তেরঙ্গা ওঠানো হচ্ছে।

রেটিং যেমন মারা গেছে, পাল্টা পনেরোজন টমিকে ওরা মেরেছে। তবু বন্দুকের আওয়াজে নয়, দিন শেষ হলো আলোচনার টেবিলে।

২২ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশ পেল পরস্পরবিরোধী আবেদন। গডফ্রের ভারতীয় নৌবহর ধ্বংস করবার হুমকির পাশাপাশি এনসিএসসি-র আবেদন--- নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন ভয় দেখানো বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে। এতদিন সমানে-সমানে আলোচনা চলছিল, এখন তার আর দরকার নেই বুঝে গেল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। তারা এও বুঝে গেল, এই বিদ্রোহে গান্ধী তথা জাতীয় নেতাদের সায় নেই। ইতিমধ্যে তারা সমস্ত শক্তি সংহত করেছে বোম্বে শহরে। তবু লড়াই ছেড়ে সরে যায় নি সাহসী রেটিং আর দেশের সাধারণ মানুষ।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আদেশ করল রেটিংদের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে। তবু ২২ তারিখ বোম্বের তথা দেশের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দিন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। ওরা কামানের মুখোমুখি হল পাথর দিয়ে। গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে চেষ্টা করল কামান আটকাবার। নিশ্চয় ওদের কোনও নেতা ছিল। তবে তিনি কোনও পরিচিত মুখ নন।

ওই লড়াইয়ে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা কত জানা যায় না। বলাই দত্ত জানিয়েছেন, মৃত ও আহতের সংখ্যা চারশো থেকে আটশোর মধ্যে। এর আগে একদিনে বোম্বেতে এত লোক মারা যায়নি। ২১ তারিখ যেমন রেটিংদের দিন, ২২ তারিখ বোম্বের শ্রমিকদের, তাদের বীরত্বের।

সন্ধ্যেবেলা জাতীয় নেতার নির্দেশ এল— অস্ত্র সম্বরণ এবং আত্মসমর্পণ। এই প্রথম আদেশ মেনে চলতে অস্বীকৃত হলো অধিকাংশ জাহাজীরা। আগে তো ঠিক ছিল জাতীয় নেতাদের থেকেই তারা নির্দেশ গ্রহণ করবেন। এখন তাঁরাই এই নির্দেশ দিচ্ছেন! বোঝাতে চেষ্টা করলেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা।

২৩ ফেব্রুয়ারি সকালে আত্মসমর্পণ। কেউ জানতেও পারল না কত হাজার জনকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কী ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের। একটি হিসাব অনুযায়ী দু'হাজারেরও বেশি রেটিংকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জাহাজ ও ব্যারাক থেকে। পাঁচশোজনের কারাদণ্ড হয়। রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা দেওয়া হয়নি, সাধারণ কয়েদি হিসাবে রাখা হয় তাদের। ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত করে জেল থেকে তাদের যার-যার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার লড়াইয়ের এইসব বীর যোদ্ধাদের যোগ্য সম্মান দিল না কেউই। তারা ডুবে গেলেন জাতীয় বিস্মৃতির গভীরে।

লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী একজন যোদ্ধা লিখছেন,'আমরা যদি আত্মসমর্পণ না করতাম, তাহলে হয়তো জাতীয় আন্দোলন ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধের দিকে না গিয়ে অন্য কোনও পথে যেতে পারত। হয়তো ভারত ভাগ এড়ান যেত। ব্রিটিশ ভারত থেকে সরে যাওয়ার প্রাক্কালে উপমহাদেশে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তার জন্য যে-সব নেতা দায়ী ছিলেন, এই বিরাট ঘটনাপ্রবাহের মধ্য থেকে হয়তো তাদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের নেতার আবির্ভাব হতো।'

এই ঘটনার দশ বছর পরে, ১৯৫৬ সালে ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতা ক্লিমেন্ট রিচার্ড এটলি কলকাতায় আসেন। এই ভদ্রলোকই যখন ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন (১৯৪৫-১৯৫১), ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দানের ব্রিটিশ সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন। ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এসে এটলি সাহেব রাজ্যপালের অতিথি হিসাবে রাজভবনে দু'দিন কাটিয়ে যান। সেই সময়ে রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তী, যিনি আবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, এটলি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন--- 'ওই সময়ে (অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে) তো এমন কিছু হচ্ছিল না যে, আপনাদের তড়িঘড়ি এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে, তবে গেলেন কেন?'

উত্তরে এটলি অনেক কারণ দেখান, তার মধ্যে যে দু'টি কারণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তার একটি হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (আইএনএ) কাজ যা নাকি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিটিকে নাড়িয়ে দিয়েছে আর অন্যটি রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহ, যা ব্রিটিশকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আর ভারতীয় সেনাদলের নির্ভরতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না। এ দেশের অনেকে না বুঝলেও, 'নৌবিদ্রোহ'-এর গুরুত্ব সঠিক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ক্লিমেন্ট রিচার্ড এটলি সাহেব।

বি:দ্র:

উৎসাহীরা এই লেখকের কালীমায়ের বোমা (প্রকাশক--- সাহিত্য সংসদ) পড়ে দেখতে পারেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিস্মৃত সৈনিক

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বীর ও বীরাঙ্গনা জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরও তাঁদেরকে এক অজ্ঞাত জীবনযাপন করতে হয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি বাহিনীর ক্যাপ্টেন নীরা আর্য ছিলেন এমনই একজন মহান দেশপ্রেমিক, নির্ভীক বীরাঙ্গনা।

নেতাজীর জীবন বাঁচাতে নীরা আর্য তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তাঁর স্বামী ছিল ব্রিটিশের গুপ্তচর। সে গোপনে নেতাজীকে হত্যা করতে এসেছিল। তাঁর অকল্পনীয় ও অনন্য সাহসিকতার জন্য স্বয়ং নেতাজী তাঁকে 'নীরা নাগিনী' বলে সম্বোধন করতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারে বন্দি সৈনিকদের মুক্তি দেওয়া হলেও ব্রিটিশ অনুগত পুলিশ অফিসার স্বামীকে হত্যার জন্য নীরাকে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁকে ভয়ানক অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

নীরাকে দেশের প্রথম মহিলা গুপ্তচর হিসেবে গণ্য করা হয়। দেশের স্বাধীনতার পর তিনি হায়দরাবাদের রাস্তার ধারে বসে ফুল বিক্রি করতেন। তিনি এক অজ্ঞাত, দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায় জীবনযাপন করতেন। কিন্তু দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে আত্মনিয়োগের জন্য কোনো ধরনের সরকারি সাহায্য বা পেনশন গ্রহণ করেননি। হায়দরাবাদের মহিলারা তাঁকে 'পেদাম্মা' বলে ডাকতেন। তাঁর জীবন নিয়ে 'নীরা নাগিনী' নামে একটি পুস্তকও রয়েছে। তাঁর ছোটো ভাইও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিক ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতেন। অনেক লোকসঙ্গীতশিল্পী নীরা আর্য ও তাঁর ভাই বসন্ত কুমারের জীবন ও কর্ম নিয়ে গান, কবিতা ও স্তোস্ত্র রচনা করেছেন।

নীরা তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। তাতে সেলুলার জেলে বন্দি থাকাকালীন ব্রিটিশদের দ্বারা অন্যায় ও অমানবিক আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দি লেখিকা মধু নীরা আর্যের বর্ণিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি উপন্যাস লিখেছেন। তাতে নীরা আর্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবদান ফুটে উঠেছে। ২০২৬ সালে হিন্দিতে তাঁর জীবনের ওপর 'আজাদ ভারত' নামে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। ১৯৯৮ সালের ২৬ জুলাই তিনি দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় মানুষেরা তাঁর মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। স্বাধীনতা দিবসে তাঁকে শত শত প্রণাম।

ডঃ রোহতাশ

জাতীয় উদ্যান

ক্যাম্পবেল বে

ক্যাম্পবেল বে জাতীয় উদ্যান আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রেট নিকোবর দ্বীপে অবস্থিত। এটি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আয়তন ৪২৬ বর্গকিলোমিটার এবং কয়েকশো দ্বীপ নিয়ে গঠিত। উদ্যানটিতে ক্রান্তীয় ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিস্তৃত গাছপালা রয়েছে। এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময় মার্চ থেকে অক্টোবর মাস। এই সময় আবহাওয়া বেশ মনোরম থাকে ও অর্কিড এবং অন্যান্য বুনো ফুল পুরোপুরি ফোটে। উদ্যানটি এমনিতেই সুন্দর, কিন্তু এই সময় আরও বেশি মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের উপর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২৩

सम्बोधनम्-पुंलिङ्गे (भाग:-२)

भो: ! बालक! (ওহে! বালক)

श्रीमन! कृपया उपविशतु।

मान्य! एकं निवेदनम् अस्ति।

मान्यवर!

महाशय!

आर्य!

महोदय!

सुधी: !

भो: ! मित्र

(এগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করা যায়।

যেমন- भो: ! मित्र! (ওহে বন্ধু) ....

ভালো কথা

রথের মেলা

রথের মেলায় প্রতিবছর আমরা খুব আনন্দ করে থাকি। এবারও সেরকম পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু একদিন আগে থেকে সারাদিন ধরে বৃষ্টি শুরু হলো। রথের দিন দুপুরের দিকে একটু বৃষ্টি কমে গেলেও বিকেলে আবার শুরু হলো। ইতিমধ্যে শ্যামল, কাজল, সুমন, দীপ, অর্ঘ্য সবাই আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলো। বাবা বলল, এই বৃষ্টিতে আর রথের মেলায় যাবার দরকার নেই। আমি জিলিপি নিয়ে আসছি। বাবা জিলিপি নিয়ে আসতেই মা থালা ভর্তি পাঁপড়ভাজা নিয়ে এলো। আমরা জিলিপি আর পাঁপড়ভাজা খেতে খেতে বাবার মুখে পুরীর জগন্নাথদেবের গল্প শুনতে থাকলাম।

সাগর সরদার, সপ্তমশ্রেণী, রাজরাজেশ্বরপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ত্তা বি ণী রি

(২) ল ভো খ গ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ল ম দ পা ন গো

(২) না ধ যো সা গ

২৭ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) চরিতকথা (২) কড়িবরগা

২৭ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) চরিত্রহনন (২) চরণকমল

(১) কুহেলী বিশ্বাস, কালীবাড়ি, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (২) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল- ৭০। (৩) পূজা মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৪) অনিরুদ্ধ হিংস, প্রতাপবাগন, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book & Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা যুদ্ধ
এক অগ্নিগর্ভ মহাকাব্য

কেশব আচার্য্য

মহাকাব্যিক এই কাহিনির সূত্রপাত ঘটে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে, যখন ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক নতুন সমীকরণের জন্ম হচ্ছিল। জেনারেল মোহন সিংহ যখন জাপানিদের সঙ্গে হাত মেলান, তখন তাঁর মনে জ্বলছিল ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জাপানিদের সঙ্গে যোগদানের প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং গভীর আত্মবিশ্বাসের উৎসাহ সঞ্চারিত করার জন্য সর্বতোভাবে এক প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন। সৈন্যদের কোনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি; তাঁদের পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছিল যে তাঁদের সামনে রয়েছে অসীম অসুবিধা, চরম বিপদ, দেনা, ক্ষুধা এবং অবর্ণনীয় কষ্টভোগ। কিন্তু ধমনীতে যাঁদের স্বাধীনতার রক্ত বইছে, তাঁরা জবাবে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৭ কিংবা ১৮ তারিখে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। মালয়ের জাপানি বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক জেনারেল ইয়ামাশিতা (Yamashita) ডেকে পাঠান মোহন সিংহকে, যাঁর সঙ্গে ছিলেন আক্রাম ও প্রীতম সিংহ। জেনারেল ইয়ামাশিতা ভারতীয়দের আশ্বস্ত করে এক যুগান্তকারী ঘোষণা করেন যে, ভারতে রাজ্য বিস্তার কিংবা কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপনের বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য জাপানের নেই, বরং ভারতীয়দের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য তারা সর্বাত্মক সাহায্য করতে প্রস্তুত। এই আশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেনারেল মোহন সিংহ এক চরম সিদ্ধান্ত নেন। যে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর যুক্ত ছিলেন, তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তিনি ডুবুরির মতো এক অনিশ্চিত ও বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে ঝাঁপ দেন— ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক সম্পূর্ণ নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করতে, যা ভাগ্যনির্ধারিতভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরবে। ১৯৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জেনারেল ইয়ামাশিতা নির্দেশ জারি করেন যে সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দি, যাঁরা জাপানিদের হাতে ধরা পড়েছেন, তাঁদের সবাইকে অবিলম্বে মোহন সিংহের হাতে তুলে দিতে হবে।

এক কলমের খোঁচায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন : ব্রিটিশদের তৈরি করা অফিসারদের মধ্যকার 'জাতি প্রথা' ও শ্রেণীবিভাগ নস্যাৎ করে দিয়ে জেনারেল মোহন সিংহ সব অফিসারের জন্য একটি মাত্র সাধারণ বিভাগ প্রবর্তন করেন। সব সুবেদার ও জমাদারকে যথাক্রমে ক্যাপ্টেন ও লেফটেনান্ট পদে উন্নীত করা হয় এবং সবার জন্য একটি সাধারণ

ফ ঃ ৬

ভোজনগৃহের ব্যবস্থা করা হয়। এই অভাবনীয় পদক্ষেপ সৈন্যদের মনে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল এবং হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতীয় সৈন্যরা এক রান্নাঘরে বসে জাতপাতের ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে খাবার গ্রহণ করেন। হুকুমের ভাষা সাময়িকভাবে ইংরেজি থাকলেও, আজাদ হিন্দ ফৌজের সরকারি কাজের ভাষা করা হয়েছিল রোমান হরফে লেখা হিন্দি। কিন্তু জাপানিদের মনস্তত্ত্ব বোঝা এত সহজ ছিল না। জাপানিদের মতো অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় জাতি এবং তাদের সামরিক অফিসারদের পক্ষে গান্ধীজীর অহিংসার দর্শন বোঝা ছিল অসম্ভব। তারা সুতো কাটার চরকা এবং অহিংসাকে পলায়নি মনোভাবণ ও কাপুরুষতা বলে উপহাস করত । এই বৈরী পরিস্থিতির মাঝেই জেনারেল মোহন সিংহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই আন্দোলনকে চরম শিখরে নিয়ে যেতে হলে এক প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, আর তাই তিনি জার্মানি থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে দূরপ্রাচ্যে নিয়ে আসার জন্য জাপানিদের ওপর ক্রমাগত প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি, তাইপিঙে বসে জেনারেল মোহন সিংহ এক দূরদর্শী ও অত্যন্ত কড়া চিঠি লেখেন জাপান সরকারের উদ্দেশ্যে। সেই চিঠিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, বার্লিনে অবস্থানরত মি. সুভাষচন্দ্র বসুর সুযোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করাকে তাঁরা বিরাট সম্মানের বিষয় বলে মনে করেন, কারণ তিনি একজন চরমপন্থী বিপ্লবী যাঁর নামেই ভারতের মাটিতে বৈপ্লবিক আলোড়ন শুরু হয়ে যাবে। তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে যেন প্রথমেই মালয় বা বার্মায় ব্যবহার না করে সরাসরি ভারতে পাঠানো হয়।

ফ্যারার পার্কের গর্জন : সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণ ও গণ-উন্মাদনা

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে এবং এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি বেলা দুটোর সময় ব্রিটিশের পক্ষ থেকে জাপানিদের হাতে ভারতীয় সৈন্যদের প্রথানুগত হস্তান্তরের অনুষ্ঠান শুরু হয় ঐতিহাসিক ফ্যারার পার্কে। বিস্তীর্ণ ফ্যারার পার্কে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিজেদের ইউনিট অনুসারে সমবেত হয়েছিলেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে লেফটেনান্ট কর্নেল হান্ট ঘোষণা করলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তিনি ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধবন্দি হিসাবে জাপান সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু এর পরের মুহূর্তটি ছিল ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় টার্নিং পয়েন্ট! মেজর ফুজিয়ারা মাইক্রোফোনের সামনে এসে ঘোষণা করলেন যে, জাপান সরকারের পক্ষ থেকে তিনি এই ৪৫,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির জিওসি ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের হাতে তুলে দিচ্ছেন! ফুজিয়ারার প্রেরণাদায়ী ভাষণের পর যখন ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানালেন, তখন সমগ্র ফ্যারার পার্ক এক উন্মত্ত জনসমুদ্রে পরিণত হলো। হাজার হাজার পাগড়ি ও টুপি শূন্যে উড়তে লাগল এবং দীর্ঘস্থায়ী উচ্চস্বরে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এই অভূতপূর্ব সাড়ার পর কুয়ালালামপুরে এক সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই বাহিনী পাঁচ ব্যাটেলিয়ানের একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ব্রিগেডে পরিণত হয়। ক্যাপ্টেন হবিবুর রহমান, এহসান কাদের, গুলজারা সিংহ, মেহবুব আহমেদ এবং ডা. তালিব দীনের মতো বহু বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ও দেশপ্রেমিক অফিসার এই আন্দোলনে যোগ দেন। হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান ও গোর্খাদের পৃথক রন্ধনশালা চিরতরে তুলে দিয়ে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম দেওয়া হয়। জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ মালয়ের জোহোরে রাজ্যে বড়ো রকমের যুদ্ধের পর, সিঙ্গাপুরের রণক্ষেত্রে পাঠানোর জন্য সৈন্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি স্বেচ্ছাসেবী আবেদন করতে শুরু করেন, যা

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in

Fax : 91-33-22202260 GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

সৈন্যদের চূড়ান্ত রণোন্মাদনারই বহিঃপ্রকাশ ছিল।

কূটনৈতিক রণক্ষেত্র : টোকিয়ো ও ব্যাঙ্কক সম্মেলন ও মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

আজাদ হিন্দ ফৌজের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য অসামরিক ভারতীয়দের নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মেলন আহ্বান করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। ১৯৪২ সালের ৯ মার্চ সিঙ্গাপুরে ২০ জন বিশিষ্ট ভারতীয়ের এক সভা ডাকা হয় এবং সেখান থেকে প্রতিনিধিরা টোকিয়োর উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু যাত্রাপথেই এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ঘটে। ১৯৪২ সালের ২৪ মার্চ প্রথম ব্যাচের সেনানীদের (জ্ঞানী প্রীতম সিংহ, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, নীলকান্ত আয়ার এবং মহম্মদ আক্রাম) বহনকারী বিমানটি জাপানের এক পার্বত্য অঞ্চলে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সমস্ত যাত্রী নিহত হন। চারজন সেনানী বীরগতিপ্রাপ্ত হন। এই প্রচণ্ড আঘাত বুকে নিয়ে ১৯৪২ সালের ২৮ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত টোকিয়োর সান্নো হোটেলে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতকে মুক্ত করার সবরকম সম্ভাব্য সাহায্যের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারণের জন্য থাইল্যান্ডের বুকে আয়োজিত হয় ঐতিহাসিক ব্যাঙ্কক সম্মেলন, যা ১৫ জুন থেকে ২৩ জুন ১৯৪২ পর্যন্ত চলেছিল। মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মা, জাভা, হংকং ও সাংহাই-সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৫০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এখানে সমবেত হন। এই সম্মেলনে প্রথম দিনে জেনারেল মোহন সিংহ একটানা সাড়ে সাত ঘণ্টা এক উত্তেজক ও ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা শুনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রধান ঐতিহাসিক প্রস্তাবসমূহ :

(১) আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, যা যে কোনো বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ, প্রাধান্য অথবা হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

(২) আন্দোলনের মূলমন্ত্র হবে ঐক্য, বিশ্বাস ও ত্যাগ। ভারতবর্ষকে এক ও অবিভাজ্য বলে মনে করতে হবে এবং সমস্ত কার্যাবলী সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিচার ছাড়াই সম্পূর্ণ জাতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনেই এক চাঞ্চল্যকর কূটনৈতিক সত্য উদ্ঘাটিত হয়। জার্মান সহকারী সামরিক দূত মোহন সিংহের সাড়ে সাত ঘণ্টার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান এবং জার্মানি ও ইতালির হাতে ধৃত ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে অনুরূপ বাহিনী গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জাপানিরা এই মেলামেশা অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে। এক গোপন বৈঠকে জাপানি মেজররেরা মোহন সিংহকে ডেকে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে এক চরম সত্য জানান যে, তারা মনে করে না ব্রিটিশ তাদের এক নম্বর শত্রু, বরং তাদের আসল এক নম্বর শত্রু হলো জার্মানি! তারা বলেছিল, ইঙ্গ-আমেরিকার শক্তি ধ্বংস হওয়ার পর বিশ্ব কর্তৃত্বের জন্য শেষ লড়াইটি হবে জার্মানি ও জাপানের মধ্যেই। এই সত্যোদ্ঘাটন ভারতের জাতীয় মুক্তি বাহিনীকে এক গভীর চিন্তায় ফেলে দেয়।

প্রথম বিভাগের গঠন এবং তীব্র অভ্যন্তরীণ সংকট : সিঙ্গাপুরে ফিরে আসার পর ব্যাঙ্ককের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পোর্টফোলিও বণ্টন করা হয়, যেখানে রাসবিহারী বসু স্বরাষ্ট্র ও অর্থ এবং জেনারেল মোহন সিংহ সৈন্যবাহিনী ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারতে শুরু হওয়া 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের তুর্য নিনাদ দূর প্রাচ্যের সৈন্যদের আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম বিভাগটি (First Division) পূর্ণ সমারোহে জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। প্রায় পঁচিশ হাজার শিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্বৃত্ত স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য নিয়ে আরও পাঁচটি নতুন ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য টোকিয়োতে পাঠানো হয়। কিন্তু পর্দার আড়ালে জাপানিদের আসল রূপ প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। জাপানিরা ব্যাঙ্কক প্রস্তাবের কোনো উত্তর দিচ্ছিল না এবং গেরিলা বাহিনীকে মূল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করছিল।

১৯৪২ সালের ২৩ নভেম্বর বার্মা থেকে ফিরে কর্নেল হবিবুর রহমান এবং ২৫ নভেম্বর কর্নেল গিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরেন যে, জাপানিরা বার্মায় ভারতীয়দের সঙ্গে প্রায় ভৃত্যের মতো ব্যবহার করছে এবং তারা ভারতীয়দের ঢাল বানিয়ে আসলে নিজেদের স্বার্থে ভারত জয় করতে চাইছে। এর প্রতিবাদে ২৯ নভেম্বর কার্যকরী সমিতি জাপানিদের এক কড়া চিঠি পাঠায়। ফলস্বরূপ, ৮ ডিসেম্বর খুব সকালে জাপানি মিলিটারি অফিসাররা এসে কর্নেল গিলকে বন্দি করে। সংকট চরম আকার ধারণ করে ১৯৪২ সালের ২৯ ডিসেম্বর, যখন কর্নেল ইয়াকুরুর দপ্তরে জেনারেল মোহন সিংহকে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাসবিহারী বসুও। জাপানিরা মোহন সিংহকে সম্পূর্ণভাবে তাদের স্পষ্ট নির্দেশাধীনে কাজ করার হুকুম দিলে, মোহন সিংহ গর্জে উঠে বলেন— 'ভারতের স্বাধীনতা আমাদের নিজেদের ব্যাপার, জাপানিদের নয়। যতক্ষণ না পরিস্থিতি সন্তোষজনক হয়, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আমাকে জাপানিদের নির্দেশাধীনে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে।'

এর পরেই রাসবিহারী বসু তাঁর পকেট থেকে একটি চিঠি বের

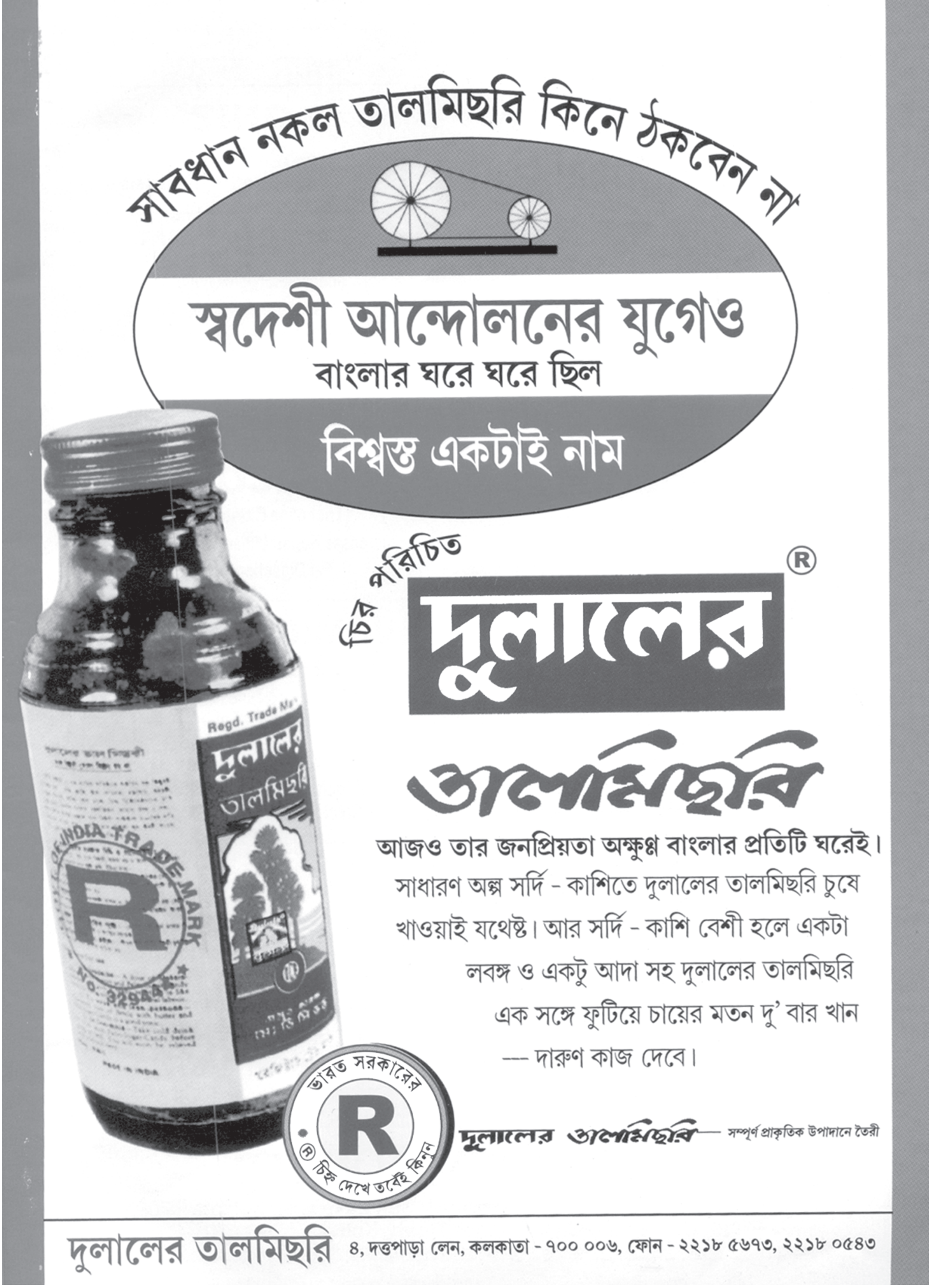
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
R
ভারত সরকারের
R
Ⓡ চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

করে কাঁপানো গলায় পড়ে শোনান, যার মাধ্যমে মোহন সিংহকে জি-ও-সি পদ থেকে বহিষ্কার করা হয় । কর্নেল ইয়াকুরু উঠে দাঁড়িয়ে বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা করেন যে, মোহন সিংহকে বন্দি করা হলো এবং তিনি এখন থেকে কেবলই 'মিঃ মোহন সিংহ'। মোহন সিংহকে পুঙ্গলের সমুদ্রতীরের এক নির্জন নৌঘাঁটির কুঁড়েঘরে বন্দি করে রাখা হয়। তবে যাওয়ার আগে তিনি ফুজিয়ারা ও সেন্দাকে স্পষ্ট বলে যান— 'সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া এই আন্দোলনকে অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। হাতের পুতুল কখনও সম্মান পায় না।'

মহাসংগ্রামের অধ্যায়— নেতাজীর দূরপ্রাচ্যে আগমন, ইম্ফল ও কোহিমার মহাকাব্য ঃ

জেনারেল মোহন সিংহের গ্রেপ্তারের পর আন্দোলন যখন মৃতপ্রায়, তখন ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে জার্মানি থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দূর প্রাচ্যে যাত্রার রুদ্ধশ্বাস অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি একটি জার্মান সাবমেরিনে করে কিয়েল ছাড়েন নেতাজী এবং তাঁর অনুগামী আবিদ হাসান। মাদাগাস্কারের দক্ষিণ-পূর্বে আড়াই মাসের অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল জলপথ অতিক্রম করে, ২৮ এপ্রিল এক রবারের ডিঙি নৌকার সাহায্যে তাঁরা একটি জাপানি সাবমেরিনে স্থানান্তরিত হন। ৬ মে সুমাত্রার সাবান দ্বীপে পৌঁছনোর পর, ১৬ মে ১৯৪৩ তারিখে নেতাজী উল্কার মতো টোকিয়োতে এসে উপস্থিত হন। টোকিয়ো রেডিয়ো থেকে একের পর এক অগ্নিগর্ভ বেতার ভাষণে তিনি সমগ্র বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেন। ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই সিঙ্গাপুরে নেতাজীর আগমন ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। ৪ জুলাই 'ক্যাথে' সিনেমা হলে রাসবিহারী বসু সমস্ত দায়িত্ব সাশ্রুনয়নে নেতাজীর হাতে তুলে দেন। ৫ জুলাই নেতাজী তাঁর ঐতিহাসিক ও অমর স্লোগান দিলেন— 'দিল্লি চলো!'

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলের মঞ্চ থেকেই নেতাজী স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার (আর্জি-হুকুমতে আজাদ হিন্দ) গঠনের ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন এবং নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার শপথ নেন । এই মন্ত্রীসভায় লদী স্বামীনাথন (যিনি ঝাঁসির রানি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন), শাহনওয়াজ খান, এ সি চ্যাটার্জি এবং ডাঃ ডি এস রাজুর মতো ব্যক্তিত্বরা শামিল ছিলেন। সরকার গঠনের ঠিক তিন দিনের মাথায়, ২৩ অক্টোবর মধ্যরাত্রে এই অস্থায়ী সরকার ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নেতাজী বন্দিদশা থেকে মুক্ত প্রাক্তন জি-ও-সি মোহন সিংহের সঙ্গে চাঙ্গির এক সমুদ্রতীরবর্তী বাংলোয় দীর্ঘ চার ঘণ্টা ঐতিহাসিক বৈঠক করেন। মোহন সিংহ নেতাজীকে জাপানিদের প্রভুত্বকামী মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানান যে ভারতে তাঁর রাজনৈতিক নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হলেও, এই আজাদ হিন্দ আন্দোলনে তিনি নেতাজীর নির্দেশেই কাজ করবেন। নেতাজী পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে জানান যে ওয়াভেলের অধীনে থাকা ভারতীয় সৈন্যরা তাঁর সীমানা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশদের ত্যাগ করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবে।

১৯৪৪ সালের শুরুতেই শুরু হয় ইতিহাসের সেই রক্তক্ষয়ী মহাকাব্য— ইম্ফল ও কোহিমার মহাসংগ্রাম। ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ৫৫ নং জাপানি বিভাগ আরাকান অভিমুখে প্রবল আক্রমণ চালায়। ১৮ ফেব্রুয়ারি জাপানি সেনাপতি মাতাগুচি তাঁর ঐতিহাসিক বিশেষ আদেশ জোরে ঘোষণা করেন যে উদীয়মান সূর্য ভারতে সুনিশ্চিত জয় এনে দেবে। শাহনওয়াজ খানের নেতৃত্বাধীন ১ নং বিভাগ, যা 'সুভাষ ব্রিগেড' নামে পরিচিত ছিল, তারাও উপযুক্ত পোশাক ও পর্যাপ্ত আধুনিক অস্ত্র ছাড়াই চরম প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মণিপুরের মৈরাঙে লেফটেনান্ট কর্নেল শওকত আলি মালিক তাঁদের হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করে ভারতের মাটিতে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কর্নেল এ সি চ্যাটার্জিকে মুক্তাঞ্চলগুলির প্রধান শাসক (গভর্নর) নিযুক্ত করে একটি 'আজাদ হিন্দ দল' গঠন করা হয়। রণাঙ্গনে কর্নেল এম জেড কিয়ানি (কর্নেল এনায়তউল্লা জান কিয়ানি)-র পরিচালনায় 'গান্ধী ব্রিগেড' চামালের পার্বত্য অঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনীর ওপরে কালান্তক আক্রমণ চালায়। কিন্তু ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস ও নিয়তি ছিল অন্যরকম। মে ও জুন মাস জুড়ে যখন ইম্ফলে চূড়ান্ত আক্রমণের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, ঠিক তখনই শুরু হলো মুষলধারে বর্ষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আকাশপথে ব্রিটিশদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও আধুনিক বিমানের রসদ সরবরাহের সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজের আধুনিক অস্ত্রহীন গেরিলা সৈন্যরা টিকতে পারল না। পাহাড়ি রাস্তাঘাট কাদায় ভেসে গেল, রসদ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে ১৯৪৪ সালের ২৬ জুলাই ইম্ফল আক্রমণ মুলতবি রাখার চরম ও বেদনাদায়ক ঘোষণা করা হয়।

এই মহাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ৭,০০০ আজাদ হিন্দ সৈনিকের মধ্যে মাত্র ২,৫০০ জন অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছিলেন; ৫০০ জন রণাঙ্গনে বীরগতিপ্রাপ্ত হন এবং আনুমানিক ২,০০০-এর বেশি সৈন্য চরম অনাহারে, মহামারী ও উপবাসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এই বিপর্যয়ের পরেও নেতাজী দমে যাননি। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে তিনি টোকিয়ো গিয়ে জাপান সরকারের সঙ্গে সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং 'হিকারি কিকান'-এর গুরুত্ব কমিয়ে দেন। তিনি সমান্তরালভাবে রাশিয়ার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালু রাখার জন্য এক গোপন কূটনৈতিক চাল প্রয়োগ করেন, যা টোকিয়োর সর্বোচ্চ সদর দপ্তর নাকচ করে দেয়। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশরা ইরাবতী নদীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে পেগনের যুদ্ধক্ষেত্রে তীব্র চাপ সৃষ্টি করলে, নেতাজী নিজে শাহনওয়াজ খানকে পোপা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় বিভাগের দায়িত্ব নিতে বলেন। তবে শাহনওয়াজ খানের মতো সেনানীদের বিশ্বাসঘাতক মানসিকতার আঁচ পেয়ে সাইগন হয়ে টোকিও যাওয়ার আগে নেতাজী তাদের কোর্ট মার্শালের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সেনাকে দু'মাসের বেতন অগ্রিম হিসেবে দিয়ে গিয়েছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। 'যুদ্ধবিরতি' ঘোষণা করে অনির্দেশের পথে যাত্রা করেছিলেন ভারতের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আজাদ হিন্দ ফৌজের এই সশস্ত্র সংগ্রাম হয়তো সামরিকভাবে সফল হতে পারেনি, কিন্তু ভারতীয়দের ধমনীতে স্বাধীনতার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তা জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, যার ফলেই পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের পর মূলতান, লাহোর, দিল্লি, বারাসাত, নীলগঞ্জ, ঝিকরগাছার সেনানিবাসে অসংখ্য যুদ্ধবন্দি আজাদি সেনাকে গুলি করে হত্যা করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। ২৬ হাজার আজাদি সেনার আত্মবলিদান কেবলমাত্র একটি যুদ্ধ ছিল না, এটি ছিল ভারতের রক্ত দিয়ে লেখা এক অমর বীরত্বগাথা। □

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লিতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপকারী বীর বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস

তরুণ বিশ্বাস

১৮৯৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অদূরে পোড়াগাছা গ্রামে এক শিক্ষিত বনেদি মাহিষ্য বিপ্লবী পরিবারে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতীক বসন্ত বিশ্বাসের জন্ম। পিতা মতিলাল বিশ্বাস ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী এবং মাতা ছিলেন কুঞ্জবালা দেবী। নদীয়ার নীল বিদ্রোহের অন্যতম মহানায়ক বিপ্লবী দিগম্বর বিশ্বাস ছিলেন বসন্ত বিশ্বাসের আপন মেজদাদু। বসন্ত বিশ্বাস তাঁর জ্ঞাতিভাই মন্মথনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে নিকটবর্তী মাধবপুর গ্রামে প্রখ্যাত সমাজসেবী জমিদার, ইঞ্জিনিয়ার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী গগনচন্দ্র বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত 'মাধবপুর শ্রীমন্ত মিডিল ইংলিশ স্কুল'-এ ভর্তি হন। গগনচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন তাঁদের নিকট আত্মীয়। সেখানকার পড়াশোনা শেষ করে ১৯০৬ সালে বসন্ত ও মন্মথনাথ নদীয়ার 'মুড়াগাছা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে' শ্রীরূপলাল খাঁর তত্ত্বাবধানে ভর্তি হন। তাঁরা থাকতেন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে।

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ও যুগান্তর দলের সহকর্মী। তিনি ছাত্রদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়া তুলে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি কামনায় বিশ্বাস-ভ্রাতৃদ্বয় বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাঁরা যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র তখন ক্ষীরোদচন্দ্র যুগান্তর দলের বিপ্লবী নেতা উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯১০ সালে দুই ভাই বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে পরিবারের সংস্পর্শ ত্যাগ করে পাকাপাকি ভাবে দেশমাতৃকার কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং যুগান্তর দলে যোগ দেন।

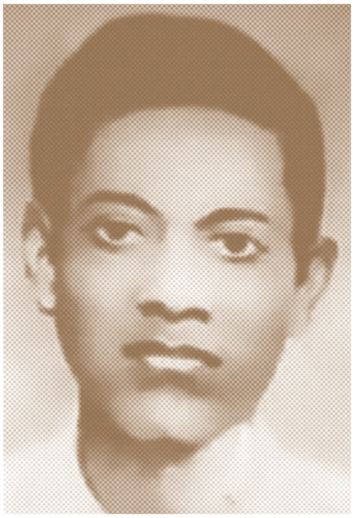

১৯০৮ সালে অমরেন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদচন্দ্র কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটের 'ওভারটুন হল'-এর নীচে 'শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড' নামে স্বদেশী পণ্যের একটি দোকান খুলেছিলেন। বসন্ত ও মন্মথ দিনে দোকানের কাজ করতেন আর রাত্রে উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথের বাড়িতে থাকতেন। এই সমবায় সমিতিটি ছিল বিপ্লবীদের একটি শক্ত গোপন ঘাঁটি। এখানে কাজ করার সুবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘটে। এই প্রতিষ্ঠানে কয়েক মাস কাজ করার পর অমরেন্দ্রনাথ বসন্ত ও মন্মথনাথকে চন্দননগরে নিয়ে যান বৈপ্লবিক কাজে শিক্ষাদানের জন্য। এই বিষয়ে চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী মতিলাল রায় তাঁর 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' গ্রন্থে লিখেছেন— ''জন্মবীর বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়— অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রমজীবী সমবায়' ব্যবসায়-কেন্দ্রে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিপ্লবকারীদের এক প্রকার আলোচনা-সভা বসিত। এই স্থানে বসিয়াই আমার বিপ্লব-কর্ম্মে কীভাবে অগ্রসর হইতেছি, তাহার পরামর্শ হইত। অমরেন্দ্রনাথ এই দুইজনকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন— দেশযজ্ঞে এই দুইজন তরুণ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তুমি এই দুইজনকে চন্দননগরে রাখিয়া বিপ্লবের কর্ম্মে নিরাপদে নিয়োগ করিও। এই সময়ে মন্মথ ও বসন্তকুমার আমার সহকারীরূপে আমার বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করে। রাসবিহারী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমার নিকট উপনীত হইলে, এই দুইজনের সহিত তাহারও পরিচয় হয়।''

১৯০৮ সালে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করার পর বিপ্লবীদের খোঁজে মুরারীপুকুর বাগানে খানাতল্লাশির সময় পুলিশ প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্যের সঙ্গে রাসবিহারী বসুর দু'খানি চিঠি পায়। পুলিশ জানবার চেষ্টা করে কে এই রাসবিহারী বসু? ব্যাপার গুরুতর দেখে মতিলাল রায়ও অন্যান্যরা রাসবিহারী বসুকে দেরাদুনে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তাঁর বাবার চেষ্টায় তিনি বনবিভাগের গবেষণাগারে সহকারী পদে চাকরি নেন। চাকরি করে অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্য রাসবিহারী বসুর আদৌ ছিল না। এই সময় রাসবিহারী দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। একদিকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজভক্ত কর্মচারীর মতো নিপুণ অভিনয়, অপরদিকে গোপনে বিপ্লবীদের নেতার কাজ। এই সময় তিনি পঞ্জাব-সহ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করে সকল বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। দেরাদুনে থাকাকালীন রাসবিহারী বসু লক্ষ্য করেন, দেরাদুনে প্রবাসী বাঙ্গালি যুবকদের বিপ্লবী দলে ভিড়াতে হলে একজন খুব বিশ্বস্ত বাঙ্গালি বিপ্লবী যুবকের একান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্বে বিপ্লবী-নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তিনি বসন্তকুমার ও মন্মথনাথের সম্যক পরিচয় পেয়েছিলেন।

বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপদান করার জন্য এঁরা স্কুল, ঘর-সংসার, গ্রাম, বাস্তুভিটা, আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। বিশ্বাস ভাইদের এই ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখে রাসবিহারী

বসু এঁদের মধ্যে বসন্তকে বেশি চটপটে ও সপ্রতিভ দেখে তাঁকেই বিপ্লবী কাজে বেশি উপযোগী মনে করে অমরেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে বসন্তকে দেরাদুনে নিয়ে যান ১৯১১ সালের শেষের দিকে। বসন্ত 'বিশু দাস' ছদ্মনাম নিয়ে রাসবিহারী বসুর বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে থাকতে শুরু করেন। (দেরাদুনে বসন্ত বিশ্বাসের ছদ্মনাম ছিল 'বিশু দাস' এবং লাহোরে তাঁর ছদ্মনাম হয় 'বিষেণ সিংহ'।)

রাসবিহারী বসু ভালোভাবেই জানতেন যে, অমরেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ও মতিলাল রায়ের আশ্রয়ে থেকে বসন্ত ও মন্মথ ইতিমধ্যে চন্দননগরে বোমা তৈরি ও বোমা ছোঁড়ার কৌশল খুব ভালোভাবেই শিখে এসেছেন। সেই সময় অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য হেমচন্দ্র কানুনগো প্যারিস থেকে সিগারেটের টিনের কৌটার সাহায্যে ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী বোমা বানানোর কৌশল শিখে এসেছেন। তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করে রাসবিহারী বসু দেরাদুনে 'টেগোর ভিলা'র আমবাগানে একটি সিগারেট টিনের কৌটোয় আনুমানিক এক পাউন্ড বারো আউন্স মাটি ভরে বসন্ত বিশ্বাসকে দিয়ে বিভিন্ন দূরত্বের নিশানায় লক্ষ্যভেদ করার অনুশীলন চালাতে থাকেন। ইতিমধ্যে বসন্ত বিশ্বাস রাসবিহারী বসুর যথেষ্ট আস্থাশীল ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। একটানা তিনমাস অনুশীলন করার পর ১৯১২ সালের মাঝামাঝি তিনি বসন্তকে লাহোরে নিয়ে এসে বিপ্লবী বলরাজের সহযোগিতায় লালা অমরচাঁদের পপুলার ফার্মেসিতে কাজে লাগিয়ে দেন, যাতে এই নবাগত বাঙ্গালিকে কেউ সন্দেহ না করে। বসন্ত থাকতেন ঝিলম নদীর তীরে বিপ্লবী বালমুকুন্দের খাপরার ঘরে।

রাসবিহারী উত্তর ভারতের সমস্ত বিপ্লবী নেতাকে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটিগঠন করেন। সেখানে একটি গুপ্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। এই গুপ্ত কমিটিতে স্থান পান মাস্টার আমীরচাঁদ, দীননাথ তলোয়ার, ভাই বালমুকুন্দ, অবোধ বিহারী, বলরাজ ও বসন্ত বিশ্বাস। বসন্তই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এই বসন্তের উপর রাসবিহারী বসু এতই আস্থাশীল ছিলেন যে, তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে কোনোদিন তিনি এতটুকুও কুণ্ঠিত হননি। সেই সময় বসন্ত হয়ে ওঠেন রাসবিহারী বসুর ডান হাত।

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশরাজ পঞ্চম জর্জ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক দরবারে বঙ্গভঙ্গ আইন বাতিল বলে ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগামী বছর ভারতের সমস্ত বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে বড়লাট হার্ডিঞ্জ (২য়) নতুন রাজধানী উদ্বোধন করবেন। রাসবিহারী এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য ১৯১২ সালের ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যার পর লাহোরে আগরওয়ালা আশ্রমে গুপ্ত সমিতির একটি মিটিং করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বসন্ত বিশ্বাস, দিল্লির মাস্টার আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, দীননাথ তলোয়ার ও লাহোরের ভাই বালমুকুন্দ। এই বৈঠকেই হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় কুশলী বোমা বিশেষজ্ঞ এবং উত্তর ভারতের কনিষ্ঠতম বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে। এত অল্প বয়সে এত গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম বলা যেতে পারে।

পরিকল্পনা মাফিক ১৯১২ সালে ২১ ডিসেম্বর রাসবিহারী— অবোধ বিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসকে নিয়ে দিল্লি পৌঁছে বিপ্লবী আমীরচাঁদের দেওয়া দিল্লির ম্যাপ দিয়ে তাঁদের দু'জনকে পুরো পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে দেন। কথা হয়েছিল প্রথমে বড়লাটকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়বে বসন্ত বিশ্বাস। সে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় বোমাটি ছুঁড়বে অবোধ বিহারী। ঘোষণা মতো ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জ হাতির পিঠে মুঘল বাদশা ব্যবহৃত মণিমাণিক্য খচিত রুপোর হাওদায় চেপে স্থানীয় রাজন্যবর্গকে নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে দিল্লি স্টেশন থেকে চাঁদনিচকের পথ ধরে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে দিয়ে আমদরবারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর বাঁ-পাশে বসে লেডি হার্ডিঞ্জ। আর তাঁদের মাথায় ছত্র ধরে রয়েছে বলরামপুর স্টেটের জমাদার মহাবীর সিংহ। রাজপথের দু'ধার জনাকীর্ণ। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের বিপরীত দিকে প্রীতমদাসজীর অট্টালিকার দোতলার বারান্দায় মেয়েরা শোভাযাত্রা দেখার জন্য ভিড় করেছিল। বসন্ত বিশ্বাস মহিলার ছদ্মবেশে লীলাবতী নাম নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে এবং পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে চলেছে ইঙ্গিতে বক্তব্য বিনিময়। হঠাৎ রাসবিহারীর মনে এই ভাবনা এলো যে, বসন্ত এতদিন সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে বোমা ছোঁড়া অভ্যাস করেছে, দোতলা বারান্দা থেকে বোমা ছুঁড়তে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। সেই কারণে তড়িঘড়ি তাঁকে ইশারায় নীচে আসার নির্দেশ দিলেন রাসবিহারী এবং চটজলদি প্রীতমদাসজীর বাড়ির স্নানাগারে মহিলার পোশাক পালটে পুরুষের বেশে রাস্তায় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতে বললেন।

শোভাযাত্রাটি কাছে এলে রাসবিহারীর ইশারা পাওয়া মাত্র বসন্ত হাতির পিঠে বসে থাকা হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমাটি ছুঁড়লে তা গিয়ে পড়ে হাতির পিঠে থাকা হাওদার ঠিক পেছনের দিকে। বিকট বিস্ফোরণ আর চোখ ধাঁধানো ঝলকানির মধ্যে শুধু একটা আওয়াজ ভেসে উঠল— শাবাস! মার ডালা। বোমার আঘাতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ গুরুতর ভাবে আহত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হাওদার মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর পিঠে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছত্রধারীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিশৃঙ্খল জনতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বসন্ত, অবোধ বিহারী ও রাসবিহারী বসু পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর তাঁরা নিজেদের কর্মস্থলে ফিরে যান। ব্রিটিশ সরকার শত চেষ্টা করেও অপরাধীকে ধরতে না পেরে অপরাধীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য দেরাদুনে বিশাল জনসভায় রাসবিহারী বসু সভাপতি হিসেবে দাঁড়িয়ে হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। এইসব আচরণ করে রাসবিহারী বসু ইংরেজদের চোখে দেবদূত হয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুদিন পর রাসবিহারী বসুর কাছে খবর আসে সিলেট জেলার মৌলবি বাজারের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অত্যাচারী গর্ডন সাহেব

মিথ্যা সন্দেহের বসে 'দয়ানন্দ আশ্রম'-এ গুলি চালিয়ে ক্যাপ্টেন মহেন্দ্রনাথ দত্তকে হত্যা করেছে এবং আশ্রমবাসীদের পশুর ন্যায় নির্যাতন করে আশ্রমটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেখানকার বিপ্লবীরা গর্ডনকে হত্যার চেষ্টা করে অসফল হন। সরকার আতঙ্কিত হয়ে তাঁকে লাহোরে বদলি করে। এবার রাসবিহারী গর্ডনকে হত্যার দায়িত্ব দিলেন বসন্ত ও অবোধবিহারীর ওপর। লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে 'মন্টোগোমারি হল' নামে একটি নৈশ ক্লাব ছিল, সেখানে গর্ডন নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ১৯১৩ সালের ১৭ মে সন্ধ্যাবেলায় পরিকল্পনা অনুযায়ী বসন্ত ও অবোধবিহারী লরেন্স গার্ডেনে যান। কিন্তু নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। তখন বসন্ত বিশ্বাস গর্ডনের ফেরার পথ 'লাইব্রেরি রোড'-এর ওপর একটি শক্তিশালী বোম রেখে চলে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গর্ডন ক্লাব থেকে বেরোনোর আগেই রামপদ রথ নামে এক চাপরাশির সাইকেলের চাকায় ধাক্কা লেগে বোমাটি ফেটে যায় এবং তার মৃত্যু ঘটে।

বসন্ত বিশ্বাস দিল্লি ও লাহোরে যে দু'টি বোমা ব্যবহার করেছিলেন, সে দু'টি বোমা তৈরি করেছিলেন চন্দননগরের বিপ্লবী মণীন্দ্রনাথ নায়ক এবং সেগুলি পরীক্ষা করে দেন রিপন কলেজের (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্ত। বোমা দু'টিকে দিল্লিতে নিয়ে যান চন্দননগরের জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ। দিল্লি ও লাহোরের ঘটনার কিনারা করতে স্কটল্যান্ড থেকে দক্ষ গোয়েন্দা দল এসে পরীক্ষা করে বলে, 'দিল্লি' ও লাহোরের বিস্ফোরিত বোমার মালমশলা এক। সম্ভবত বঙ্গপ্রদেশে তৈরি বোমাটি। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বঙ্গপ্রদেশে অনুসন্ধানের তৎপরতা বাড়ে। অবশেষে ১ বছর পর ১৯১৪ সালে রাজাবাজারে কলকাতা ট্রামওয়ে অফিসারদের মেসে তল্লাশি চালিয়ে 'অনুশীলন' দলের বোমা বিশেষজ্ঞ অমৃতলাল হাজরার সহকর্মীর পকেট থেকে পুলিশ সাংকেতিক নাম-ঠিকানা যুক্ত একটি চিঠি পায়। ডেনহ্যাম চিহ্নের মর্মোদ্ধার করে কিছু বিপ্লবীর নাম ঠিকানা জানতে পারেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ তারিখে দীননাথ তলোয়ার গ্রেপ্তার হন। এদিকে দীননাথ প্রাণ বাঁচাতে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হয়ে রাসবিহারী-সহ কয়েকজন বিপ্লবীর নাম বলে দেন। পরে তাঁরই স্বীকারোক্তিতে বলরাজ ভাল্লা, বালমুকুন্দ, আমীরচাঁদ ও অবোধবিহারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বসন্ত ও রাসবিহারী আত্মগোপন করে থাকেন।

ইতিমধ্যে বসন্তের বাবার মৃত্যু হয়। ১৯১৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বসন্ত ঘাটশ্রাদ্ধের দিন কেনাকাটার উদ্দেশে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে তাঁর অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ছোটোকাকা প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে ওঠেন, তখনই প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাসের এক আত্মীয় সরকারি চাকরিতে পদোন্নতির লোভে বসন্ত বিশ্বাসের খবর থানায় জানায়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ বাহিনী নিয়ে দেরাদুনের ডিএসপি সুশীল ঘোষ নিরস্ত্র বসন্তকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাঁকে ধরতে আসছে, এই খবর দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ মন্মথনাথকে বসন্তের কাছে শেষ মুহূর্তে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বসন্ত পালানোর সুযোগ পায়নি।

এরপর বসন্ত বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় পুলিশের সদর দপ্তরে এনে জেরা করার সময় তাঁর মুখ থেকে দলের নাম বের করার জন্য বাঙ্গালি গোয়েন্দারা বসন্ত বিশ্বাসের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল। কিন্তু বসন্ত শত অত্যাচারের মুখে কোনো অবস্থাতেই দলের কোনো ব্যক্তির নাম করেনি। তাই প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় তাঁর 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' বইতে লিখেছেন, 'সেই নির্ভীক বাঙ্গালি তরুণের মুখে পুলিশের শত অত্যাচারে একটি কথাও উচ্চারিত হয় নাই। তাহা যদি হইত অমরেন্দ্রনাথ ও আমি যুগপৎ বন্দি হইতাম।'

ইংরেজ পুলিশ বসন্ত-সহ ধৃত অন্য দশজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহ, হত্যা ও বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার অভিযোগ এনে দিল্লি ও লাহোরের ঘটনা একত্রিত করে 'দিল্লি-লাহোর ষড়যন্ত্র' নামে ঐতিহাসিক মামলা শুরু করে ১৬ মার্চ ১৯১৪। এই মামলায় দীননাথ তলোয়ার ছিল প্রধান রাজসাক্ষী, আর এক রাজসাক্ষী হলো বিপ্লবী নেতা মাস্টার আমীরচাঁদের পোষ্যপুত্র সুলতানচাঁদ।

১৯১৪ সালে ২১ মে দিল্লির অ্যাডিশনাল সেশন জজ্ মি. হ্যারিসনের আদালতে ওই ঐতিহাসিক মামলার বিচারে প্রহসন শুরু হয়। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি প্রথমে ব্যারিস্টার এস.কে. সেন এবং পরে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশকে এই মামলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। মামলার সকলপ্রকার তদারকি করেন বিপ্লবী মন্মথনাথ বিশ্বাস। ৫ অক্টোবর দিল্লি কোর্ট আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসির হুকুম দেয় এবং নাবালক বিবেচনায় বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। ইংরেজ সরকার বসন্তকে ফাঁসি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লাহোর হাইকোর্টে আপিল করে। এই আপিলে বসন্তের বয়স ২-৩ বছর কারচুপি করে বাড়িয়ে ২৩ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল সাবালক বসন্ত বিশ্বাস তাঁর ওইসব কাজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। একতরফা বিচারে ১৯১৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বসন্ত বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। এরপর বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা হলে আপিল ১৯১৫ সালে এপ্রিল মাসে অগ্রাহ্য হয়। ১৯১৫ সালের ৮ মে দিল্লির সেন্ট্রাল জেলে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসি হয়।

বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয় পঞ্জাবের আম্বালা জেলে ১০ মে (মতান্তরে ১১ মে) মাত্র ২০ বছর বয়সে। শত অনুরোধ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার সৎকারের জন্য বসন্তের মহদেহ তাঁর প্রিয়জনদের হাতে তুলে দেয়নি। প্রিয় শিষ্য বসন্তের মৃত্যুতে ফাঁসির দু'দিন পরে ১৯১৫ সালের ১২ মে রাসবিহারী বসু পি.এন. ঠাকুরের ছদ্মবেশে চিরতরে ভারত ছেড়ে 'সানুকিমারু' জাহাজে জাপানে রওনা হন দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। বসন্তের স্মৃতি রক্ষার্থে রাসবিহারী বসু নিজের হাতে জাপানের টোকিয়ো শহরে মাদাম তেৎসু-কোং-হিওচির বাগানে 'ওক' গাছের স্মৃতিফলক প্রোথিত করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাসবিহারী বসু ভুলতে পারেননি তাঁর প্রিয় মন্ত্রশিষ্য বসন্ত বিশ্বাসকে। □